অদ্ভুত স্বপ্ন

বা

স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

প্রণীত।

কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞান যন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫।

বিজ্ঞাপন।

—০:-০-:০—

এই স্ত্রী পুরুষের বিবাদ স্বপ্ন ব্যাপার হইলেও এক কালে উপেক্ষণীয় নহে। কেন না সকল স্বপ্ন মিথ্যা হয় না, অনেক স্বপ্ন সত্য হইতেও দেখা যায়। বিশেষতঃ কোন কোন দর্শন-কারের মতে এই বিশ্বব্যাপার সমস্তই স্বপ্ন মাত্র। অতএব ভরসা করি পাঠকগণ স্বপ্ন বলিয়া ইহাকে একেবারে উপেক্ষা করিবেন না। সহৃদয় পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন এই স্বপ্ন [illegible] সত্য কি না—অন্ততঃ সম্ভব কি অসম্ভব বিবেচনা করিয়া দেখিলেও কৃতার্থ হইব।

সহচরী নামক মাসিক পত্রিকায় ইহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক পাঠক এই অদ্ভুত স্বপ্ন শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য ইহা প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশ অনেক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক দোষ রহিয়াছে। পাঠকগণ ইহাকে স্বপ্ন জানিয়া ইহার সে সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিবেন। ৩০শে বৈশাখ ১২৯৫ সাল।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।
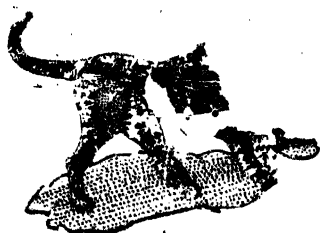
অদ্ভুত স্বপ্ন

বা

স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব।

উপক্রমণিকা।

আহা! কি স্বপ্ন দেখিলাম, এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমি কখনও দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছি যদিও সমস্ত স্মরণ নাই; কিন্তু যাহা স্মরণ আছে তাহা মনে করিয়াই আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। পাঠকগণের যদি কৌতুহল থাকে তবে শ্রবণ করুন।

দেখিলাম কোন নির্জ্জন গৃহ মধ্যে একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী যুবতী রমণী নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছেন। যদি সে রমণীর রূপরাশি বর্ণনা করিবার শক্তি থাকিত তাহা হইলে আমি তাহার রূপ বর্ণন করিতাম। যদি মনুষ্য এমন কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিত যে তদ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে আমি পৃথিবীর সমস্ত লোককে উন্মত্ত করিতে পারিতাম। বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলে দৈত্যমণ্ডলীর যে দশা ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে আজি আমি সমগ্র পৃথিবীর সেই দশা ঘটাইতে পারিতাম। তাহা যখন পারিব

না তখন সে অলৌকিক রূপের কিয়দংশ বর্ণনা করিয়া সেই-রূপসাগরের অবমাননা করিব না।

রমণী একাগ্রচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছেন, আমি তন্ময় হইয়া যুবতীর রূপরাশি দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে পার্শ্ব-বর্ত্তী দ্বার উদ্ঘাটন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দ অনু-সারে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে দেখিলাম ঐ দ্বার দিয়া একটী ভুবনমোহন যুবা পুরুষ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি বলিব আমি পুরুষ, যদি কোন রমণী তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে না জানি তাঁহার কি দশা ঘটিত। বোধ হয় সমস্ত নারী সমাজ ঐ যুবাকে দেখিয়া কুল মান ও লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাহার পক্ষপাতিনী হইতেন। আমি জানি না ঐ যুবতীর রূপ অধিক কি, ঐ যুবকের রূপ অধিক। আমি পুরুষ, সুতরাং আমাকে রমণী রূপের পক্ষপাতী হইতে হইবে, কিন্তু যদি কোন রমণী তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে ঐ রমণীর সহিত আমার বিতণ্ডার শেষ হইত না যুবা ধীরে ধীরে যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু রমণী পুস্তক পাঠে এত মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন যে দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ বা যুবকের পদধ্বনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না। যুবক অনেকক্ষণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন এখনও যুবতী তাঁহার দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলেন না, তখন তিনি আপনার বাহুলতা দ্বারা যুবতীর বক্ষঃস্থল বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং প্রণয়-পূর্ণ ঈষদ্ধাস্য মুখে কহিলেন হৃদয়ে-শ্বরি! পুস্তক পড়িতে যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছ আমি যে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি তাহা কি কিছুমাত্র জানিতে পার নাই? যুবতী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া লজ্জানম্র

বচনে কহিলেন হৃদয়েশ্বর অথবা সর্ব্বেশ্বর! পুস্তক পড়িতে আমি সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। তোমাদের গুণের কথা চিন্তা করিয়া আমার অন্তরাত্মা কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না।

যুবক নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিতের ন্যায় কহিলেন আমার কি দোষের কথা ঐ পুস্তকে লেখা আছে? যুবতী সহাস্যে কহিলেন একা তোমার নহে, তোমার জাতির—স্বার্থপর পুরুষ জাতির। সেই সকল আলোচনা করিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছি। তোমাদের প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আমি জানিতাম তোমরা স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু ও পরম সহায়, মুখেও বলিয়া থাক "আমি তোমাগত-প্রাণ, তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী"। কিন্তু সে সকল বাক্য যে কেবল আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মুখে মাত্র বলিয়া থাক—তা আমি একদিনও ভাবি নাই। অবলা যে বাস্তবিক অবলা নহে, তোমাদের বিষম অত্যাচারে অবলা হইয়াছে ও বন্দিনী হইয়া চিরসেবিকা হইয়াছে, তাহা আমি এত দিন জানিতাম না। হা ধিক্! পুরুষ পশ্বাচরণে রমণীর দেবতা হইয়াছে—বাস্তবিক তোমরা নিতান্ত নিষ্ঠুর—নিতান্ত স্বার্থপর—নিতান্ত অধার্ম্মিক। ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার মানব নামধারী জীবের যোগ্য নয়।

যুবক একদৃষ্টে যুবতীর মুখপানে চাহিয়া অবাক্ হইয়া যুবতীর এই বক্তৃতা শুনিতেছিলেন, কিন্তু মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, প্রাণেশ্বরি! তোমার হঠাৎ এ দিব্য জ্ঞান কোথা হইতে হইল? ঐ পুস্তক পাঠে কি এই বিসদৃশ জ্ঞান জন্মিয়াছে? দেখি ওখানি কি পুস্তক।

রমণী গম্ভীরস্বরে কহিলেন "কেবল এ পুস্তক নহে, এক্ষণে

অনেক পুস্তক ও পত্রিকায় তোমাদের পুরুষ জাতির গুণের কথা প্রকাশিত হইতেছে। আর ঢাকা থাকিবার যো নাই—আর অত্যাচার করিতে পারিবে না, তোমাদের আধিপত্যের লোপ হইতে চলিল. জান না এক্ষণে বিদূষী রমণীগণ আর অন্তঃপুরে বাস করেন না। ছি! পুরুষজাতি এমন স্বার্থপর! নারীকে অবলা করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে কি তোমাদের লজ্জাও হয় না? তোমাদের কি ধর্ম্মের ভয় নাই—পর কালের ভয় নাই?

যুবক।—"কেবল পুস্তক পড়িয়া পুরুষকে অত্যাচারী জানিয়াছ না পরীক্ষা দ্বারা তাহার কিছু প্রমাণ পাইয়াছ"?

রমণী।—পরীক্ষা করিয়া জানিবার তত উপায় পাই নাই, কারণ আমরা সকল দিক দেখিয়া উঠি এমন শক্তি আমাদের নাই, আমাদের সে শক্তি তোমরা হরণ করিয়াছ। বিশেষতঃ তোমার মত উত্তম স্বামী পাইয়াছি বলিয়া আমি অধিক কষ্ট পাই নাই, সুতরাং বুঝিবার সেরূপ চেষ্টাও করি নাই।

যুবক।—যখন তোমার পরীক্ষা-সিদ্ধ কোন জ্ঞান নাই তখন তুমি কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা বিশ্বাস করিলে কেন? গ্রন্থকার যে ভ্রান্ত হয়েন নাই তাহা তুমি বুঝিলে কি প্রকারে? গ্রন্থকার যে ছেলে ছোকরা নহেন—শিক্ষা বিভ্রাটগ্রস্ত নহেন তাহা কি তুমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ? মুদ্রিত বর্ণ বিশিষ্ট পুস্তকাকার পদার্থ মাত্রই কি গ্রন্থ পদ বাচ্য? বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক পুরুষের লেখা, রমণীজাতি বাস্তবিক অত্যাচার-পীড়িত হইতেছে কি না তাহা পুরুষ অনুমান দ্বারা ভিন্ন জানিতে পারে না। অনুমান যে সত্যের মূল, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কতদূর যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা কি

একবারও বিবেচনা কর নাই? তুমি কি জাননা ঐরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসে সমধিক অমঙ্গল ঘটে! বিবেচনা কর দেখি যদি ভ্রান্ত বিশ্বাস হেতু পুরুষদিগকে বৃথা নিন্দা করিয়া থাক তাহা হইলে কি তোমার অন্যায় কার্য্য করা হয় নাই ও তাহাতে কি তোমাতে পাপ অর্শে নাই?

রমণী কহিল "কেন আমি কি না বুঝিয়া কেবল মাত্র পুস্তকের লেখায় বিশ্বাস করিয়া পুরুষদিগকে দোষী বলিয়াছি? প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলে ত তুমি স্বীকার করিবে? পুরুষেরা যে স্ত্রী জাতির প্রতি আত্মসুখের জন্য অত্যাচার করে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। বাল্যবিবাহ, স্ত্রীজাতির অস্বাতন্ত্র্য এবং স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ নিষেধই ইহার প্রচুর প্রমাণ। এই সকল কি স্ত্রী জাতির প্রতি পুরুষের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে? তাহা যদি না হয় তবে জানি না আর কিরূপ প্রমাণের প্রয়োজন!

যুবক।—জীবিতেশ্বরি! তোমার ভ্রম হইয়াছে। এই সকল দ্বারাই কি পুরুষের অত্যাচার প্রমাণিত হইবে? কখনও না। এস-আমরা একটী একটী করিয়া ঐ সকলের বিচার করিয়া দেখি। তোমাকে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছি তখন তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। একটি গল্প মনে পড়িল, সেটি এই সময় বলিয়া যাই মনে রাখিও।. কোন ব্যাক্তি নিজ অসচ্চরিত পুত্র ও কন্যার সুশিক্ষা বিধান জন্য বাটীতে মহাভারত পাঠ দিয়াছিলেন; পাঠ সমাধানান্তে পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু! ভারত পাঠ করিয়া কি শিক্ষা করিলে? পুত্র কহিলেন পরশু-রাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃ হত্যা করিয়াছিলেন। অবশেষে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলে কন্যা কহিল দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল।

পুত্রকন্যার উত্তর শুনিয়া তাহাদের পিতা কপালে করাঘাত করিয়া মনে মনে কহিলেন উপদেশ পাত্র অনুসারে সঞ্চারিত হয়। আজি কালি নব্য যুবকগণ ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে ঐরূপ বাছিয়া বাছিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। তোমাকে যখন আমি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছি, তখন তোমারও যে ঐরূপ শিক্ষা হইবে তাহা আশ্চর্য্য নয়। যাহা হউক এক্ষণে বল দেখি বাল্যবিবাহ দ্বারা তোমাদের প্রতি কি অত্যাচার করা হইয়াছে?"

যুবতী হাসিতে হাসিতে কহিলেন "তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? সামান্য চিন্তা করিলেই কি উহা বুঝা যায় না? আমাদের যে বিবাহ হইয়া থাকে তাহা কি বাস্তবিক বিবাহ পদবাচ্য? আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন কি আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম কে আমার স্বামী হইতেছে? যদি ভাগ্যবশতঃ তুমি ভাল না হইয়া মন্দ হইতে তাহা হইলে কি আমার দুঃখের সীমা থাকিত? কত কুলকামিনী অতি অধম স্বামীর যন্ত্রণায় নিয়ত দুঃখ পাইতেছে। অধিক বয়সে অর্থাৎ যখন জ্ঞান সঞ্চার হয়, তখন যদি বিবাহ হইবার নিয়ম হইত তাহা হইলে কি আমরা নির্ব্বাচন করিয়া মনোমত স্বামী গ্রহণ করিতে পারিতাম না? এবং তাহা হইলে কি সকল রমণীর কষ্ট নিবারণ হইত না? মন্দ স্বামী হইতে রমণীগণ যে কষ্ট পায় সে কি বাল্যবিবাহের দোষে নহে? কেন পুরুষ অন্যায় করিয়া স্ত্রীজাতিকে এরূপ দুঃখ প্রদান করে?"

যুবক।—"আচ্ছা বল দেখি আমি যখন বিবাহ করিয়াছিলাম তখন কি আমি নিজে পছন্দ করিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম? না, পিতার আদেশানুসারে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি?

আমার ভাগ্যে তোমার ন্যায় সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী না যুটিয়া অতি কুৎসিতা ও দোষসম্পন্না নারী যুটিতেও ত পারিত। তবে কি আমি বলিব পুরুষ জাতি নিতান্ত অত্যাচারিত? বাল্যবিবাহের যে দোষের কথা বলা হইল তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। যদি ঐ নিয়ম অত্যাচার করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্যই হইয়াছে। এ কথা কখন বলিতে পার না যে উহা কেবল স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য কৃত হইয়াছে। কেননা নির্ব্বাচন করিবার শক্তি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সমান, যদি পুরুষ স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইত ও স্ত্রী স্বামী নির্ব্বাচন করিতে না পাইত, তাহা হইলে অবশ্য পুরুষকে অত্যাচারী বলা যাইত। কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন কি প্রকারে পুরুষকে অত্যাচারী বলা যায়।

রমণী।—"অবশ্য আমি স্বীকার করি যে উহা দ্বারা পুরুষেরও সমভাবে ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ঐ নিয়মের বিধাতা কে? ঐ নিয়ম কি একাকী পুরুষে করে নাই? যখন একাকী পুরুষ অনিষ্টকর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তখন পুরুষের দোষ নয় কি স্ত্রীর দোষ? তোমরা যদি আপন ক্ষতি আপনি কর তাহাতে আমার বা অন্যের দোষ হইতে পারে না।"

যুবক।—"আমি তোমাদিগের দোষ দিতেছি না, দোষ আমাদের স্কন্ধেই লইতেছি। তবে আমি বলিতেছি, যে, যদি বাল্যবিবাহ প্রথা অনিষ্টকর হয় তাহা হইলে তুমি বলিতে পার, পুরুষ বড় নির্ব্বোধ, এমন নির্ব্বোধ যে আপনার পায়ে আমি কুড়ালি প্রহার করে। কিন্তু তুমি

এমন কথা বলিতে পার না, যে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করিবার মানসে বা আত্মসুখ সাধনোদ্দেশে বাল্য-বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুরুষ বুঝিয়া না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মনে যে কোনও কু অভিসন্ধি নাই তাহাতে কিছু সন্দেহ থাকিতেছে না। বাল্যবিবাহ বাস্তবিক অনিষ্টকর কি না, তাহা আর এক সময়ে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে তাহা দেখা আবশ্যক নয়, কেন না এখন কেবল বিচার্য্য এই যে বাস্তবিক পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করিতেছে কি না? বাল্যবিবাহ প্রথা যে সে উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রবর্ত্তিত করা হয় নাই তাহা বোধ হয় এখন তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে"।

রমণী"—আচ্ছা, বাল্যবিবাহের কথা আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিতেছি, কেন না উহাতে পুরুষেরও অনিষ্ট আছে। কিন্তু বল দেখি পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে বলপূর্ব্বক আপন অধীন করিয়া রাখিয়াছে কেন? যখন সমদর্শী পরমেশ্বর নর নারী উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদিকে অবশ্যই সমান করিয়াছেন। তবে কেন নর নারীকে অধীন করিয়া কষ্ট প্রদান করে? কেন নর পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ অকার্য্য করে। ইহা কি মানবের অত্যাচার নহে? পরমপিতা সমদর্শী পরমেশ্বর স্ত্রীপুরুষ সকলকেই সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—সকলকেই সমান স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া স্ত্রী-দিগকে অধীন করিয়াছ ও তাহাদিগকে সকল স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে এমত দুর্ব্বল করিয়াছ যে, এক্ষণে স্ত্রীজাতির নাম হইয়াছে অবলা। বাস্তবিক স্ত্রীজাতি অবলা নহে। তোমরা তাহাদের বল হরণ করিয়া অবলা করিয়াছ এবং তোমরাই তাহাদিগকে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছ।

যুবক।—ঈশ্বর যে স্ত্রী ও পুরুষকে সমান শক্তি ও সমান স্বত্ব দিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? কি প্রকারে জানিলে পুরুষ অস্বাভাবিক উপায়ে নারীকে অধীন ও দুর্ব্বল করিয়াছে? একজন কি আর একজন সমশক্তিমানকে আয়ত্ত করিতে পারে? দুইজনের মধ্যে কাহার শক্তি অধিক, কাহার শক্তি অল্প ও কোন দুইজনই বা সমশক্তি সম্পন্ন তাহা বুঝিবার উপায় কি? জয় পরাজয় দেখিয়া কি আমরা উহা স্থির করি না? যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে স্ত্রী জাতি পুরুষের অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছে তখন কি প্রকারে বলিব স্ত্রী পুরুষের তুল্য শক্তিসম্পন্ন? তাহা যদি হইত তাহা হইলে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীরাও পুরুষকে অধীন করিতে পারিত: কিন্তু তাহা যখন পারে নাই তখন অবশ্যই বলিতে হইবে স্ত্রী জাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল।

রমণী।—তুমি ও কিরূপ কথা বলিতেছ? প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি কি কখনও বিশিষ্ট কারণে দুর্ব্বলের অধীন হয় না? ইংরাজ ভারতবাসীকে পরাজয় করিয়াছে বলিয়া কি তুমি বলিবে পরমেশ্বর ভারতবাসীকে ইংরাজের অপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?

যুবক।—আমি অবশ্য তাহা বলিতে পারিতাম, যদি চিরকালই ভারতবাসীকে পরের অধীন থাকিতে দেখিতাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে এক কালে ভারতবাসী পৃথিবীর সকল জাতির উচ্চ ছিল; এই জন্য ভারতবাসীকে স্বভাবদুর্ব্বল বলিতে পারি না। তুমি যদি ঐরূপ দেখাইতে পার এক কালে স্ত্রীজাতি পুরুষের পদবীতে ও পুরুষ স্ত্রীজাতির পদবীতে আরূঢ় ছিল তাহা হইলে আমি কখনই স্ত্রীদিগকে অবলা বলিতে পারিব না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, সর্ব্বকালে ও সকল দেশেই স্ত্রীজাতি

পুরুষের আশ্রয়ে বাস করে তখন, কেন না বলিব পরমেশ্বর স্ত্রীকে পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়াছেন ও তাহাদিগকে পুরুষের আশ্রয়ে অবস্থিত থাকিতে বলিয়াছেন? তাহা যদি না বল যদি "ঈশ্বর সকলকেই সমান করিয়াছেন" এই কল্পিত মতের উপর বিশ্বাস মাত্র করিয়া স্ত্রীকে পুরুষের সহিত সমান বল তাহা হইলে, ছাগ মেষকে সিংহ ব্যাঘ্রের সমান বলিতে হয়, মৎস্যকে কুম্ভীরের সমান বলিতে হয়, ও পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলকেই সমশক্তি সম্পন্ন বলিতে হয়।

রমণী।—ইতরপ্রাণীর কথা বলিতেছ কেন? ইতরপ্রাণীর সহিত মনুষ্যের তুলনাই হইতে পারে না।

যুবক।—কেন? পরমেশ্বর কি কেবল মানবেরই পরমেশ্বর? ইতরপ্রাণী কি তাঁহার সৃষ্ট নহে। তুমি কিসে বুঝিলে যে পরমেশ্বর ইতরপ্রাণীসকলকে সমান করেন নাই, কেবল মানব জাতিকেই পরস্পর সমান করিয়োছন? তুমি কিসে বুঝিলে যে ইতরপ্রাণী-রাজ্যে বৈষম্য প্রচার করিলে পরমেশ্বরের সমদর্শী নামের কলঙ্ক হয় না? তোমার মূল সূত্র (Axioum) ভুল হইতেছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে জগৎ বৈষম্যময়, যে দিন জগতে পূর্ণ সাম্য বিরাজিত হইবে সে দিন সৃষ্টির লোপ হইবে—সকলই আকাশময় হইবে। এ তত্ত্ব বুঝা বড় সহজ নহে। বাস্তবিক ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা সহজে তুমি কি আমি নিরূপণ করিতে পারি না। তিনি সকলকেই সমান করয়িাছেন কি অসমান করিয়াছেন তাহা নিরূপণ করিতে হইলে অনেক বিতণ্ডা ও অনেক সূক্ষ্মদর্শনের প্রয়োজন। সে সকল বুঝিবার শক্তি তোমার নাই সুতরাং সে কথা এক্ষণে থাকুক। কিন্তু বল দেখি তোমরা আমাদের অধীন, না আমরা তোমাদের

অধীন? তুমি বলিতেছ তোমরা আমাদের অধীন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন প্রথমে অর্থাৎ পরিণয়ের পর আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, তখন তুমি আমার সাধনা করিয়াছিলে? না আমি নিতান্ত অধীন ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছি? চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ মুখব্যাদান করিয়া অমৃত নিঃসন্দীবাক্য কথন জন্য তোমার কত সাধনা করিয়াছি, তাহা কি স্মরণ হয় না? এখনও কি তাহা স্মরণ করিলে তোমার মনে দুঃখের উদয় হয় না? সে সময় তোমার কি মনে হইত? তুমি দাসী আমি প্রভু মনে হইত? না আমি দাস তুমি প্রভু মনে হইত? পরে যখন তুমি আমার দুষ্কর আরাধনা ও নিয়ত তপশ্চর্য্যায় তুষ্ট হইয়া আমার প্রার্থনা সকল পূরণ করিতে লাগিলে, তখন কি আমি নিরতিশয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম না? ঐ কৃতজ্ঞতার ও দাসত্বের যদি কিঞ্চিৎ ত্রুটী হইত তাহা হইলে তুমি কিরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতে, স্মরণ করিয়া দেখ দেখি! ঐ রাগের সমতা করিতে কত রাত্রি বিনা নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়াছে ও কত দিন অশ্রুজলে সমস্ত শয্যা আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। এমন কত দিন হইয়াছে, যখন দেখিলাম এত আরাধনাতেও তোমার ক্রোধের শান্তি করিতে পারিলাম না— তোমার তুষ্টিলাভে কৃতকার্য্য হইলাম না, তখন (দেহি পদপল্লব মুদারম্) তোমার চরণে মস্তকার্পণ করিয়াছি। সে সকল সময়ে তুমি কি ভাবিয়াছিলে? তখন কি ভাব নাই যে, আমি তোমার একান্ত অনুগত দাস? ক্রমে যত বড় হইতে লাগিলে ও দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলে পুরুষ জাতি বিনা বেতনের গোলাম, তখন কি

তোমার মেজাজ আরও গরম হইয়া উঠে নাই? তখন হইতে কি লম্বা চৌড়া ফরমাইজ আরম্ভ কর নাই? আজি বানারসি কাপড় চাই, আজি হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার চাই, আজি ভ্রাতা বা ভগিনীর জন্য অর্থ চাই ইত্যাদি হুকুম দ্বারা কি আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটী করিয়াছ? অবশ্য কিছুতেই নয়। বল দেখি যখন তুমি এই সকল অনুজ্ঞা প্রচার কর, তখন কি তুমি মনে কর তুমি একজন অধীনা দাসী মাত্র? তাহা মনে করা দূরে থাকুক তুমি একবারও মনে কর না যে, এত লম্বা চৌড়া ফরমাইজ করিতেছি, অনুগত দাস বেচারা ইহা পালন করিতে সমর্থ হইবে কি না। বেতনভোগী বা ক্রীতদাসের প্রতি হুকুমেরও সীমা আছে—কিন্তু পুরুষ দাস বেচারীর উপর নারীজাতীর হুকুমের কিছুমাত্র সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ঐ বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া ঐ দাসত্ব কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য "চুরি করা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন"। প্রাণেশ্বরি! এ সকল কি স্ত্রীজাতির অধীনতা না অটল প্রভুতা? তোমাদিগকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া আমরা কি জন্য পর্ব্বতে, অরণ্যে, রৌদ্রে, বাতে, জলে, স্থলে, দিবা নিশি ভয়ানক কষ্ট করিয়া বেড়াই? কিসের জন্য আমরা প্রাণ, মান থাকিবে কি না বিচার না করিয়া অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকি? এবং কাহার পূজার জন্য আমাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়িয়া গড়াইয়া যায়? সকলই কি রমণীর প্রসন্ন আননে মধুর হাস্য দেখিবার জন্য নহে? দেখ প্রেয়সি! যে ব্যক্তি রমণীর দাসত্ব স্বীকার করে নাই, সে কি নারী-দাসদিগের ন্যায় অহরহ ক্লেশ স্বীকার করে? কখনই না।

নিয়তই সে সতেজে কার্য্য করিয়া থাকে। সে জ্ঞানসাগর মন্থন করে, পৃথিবীর বন্ধু হয়, ঈশ্বরের উপাসক হয়, কিন্তু কিছু-তেই তেজঃশূন্য হয় না; কিন্তু রমণীদাসদিগের দুরবস্থা কি স্বচক্ষে দর্শন করিতেছ না? তাহারা কেবল তোমাদের দাসত্ব করিয়া অব্যাহতি পায় না। তোমাদের জন্য তাহাদিগকে পৃথিবীর সকলের নিকটেই অধীনতা স্বীকার করিতে হয়।"

যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জানম্র স্বরে কহিলেন "এরূপ দাসত্ব তোমরা ইচ্ছা করিয়া কর। আমরা কথা কহি না, কহাইবার জন্য চেষ্টা কর কেন? চুপ করিয়া থাকি-লেই ত হয়। তোমাদের লজ্জা ও ধৈর্য্য নাই, তাই তোমাদের প্রয়োজন সাধন জন্য আমাদের সাধনা কর। ইহার পরে রমণী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম না।"

যুবা কিঞ্চিৎ গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"তোমাদের লজ্জা ও ধৈর্য্য যথেষ্ট আছে ও প্রয়োজনও নাই মানিলাম, কিন্তু তবে রমণীগণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে কেন? বিধবা বিবাহের জন্য এত ডামা ডোল কেন? সে সব কথা যাউক—কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ত আমারা বল দ্বারা সাধন করিতে পারি। তাহা না করিয়া যখন তোমাদের আরাধনা করি ও তোমাদের সুখের জন্য এত ব্যতি-ব্যস্ত থাকি তখন আমরা স্বাধীন ও তোমরা পরাধীন এ কথা বল কেন?"

রমণী।—"তুমি কি মনে করিতেছ সে কথা বলিবার কারণ নাই? তুমি আমাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ কেন? অন্তঃপুর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে আমাদিগকে যাইতে দেও না কেন? সুবর্ণ পিঞ্জরে সুবর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধা কি বাঁধা নয়? পোষা পাখীর সুখের জন্য তুমি যথেষ্ট চেষ্টা ও শ্রম কর

বলিয়া কি পাখীকে স্বাধীন ও তোমাকে অধীন বলিতে হইবে?”

যুবক।—“তোমাদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখি বলিলে। ইহা কি পুস্তক পাঠ করিয়া বলিলে না নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিলে? তোমরা কি ইচ্ছামত গ্রামস্থ প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গমন করিয়া থাক না? না দূরস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাও না? তোমরা কি নিমন্ত্রণ বা কোন প্রকার আত্মীয়তা রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন গ্রামে পদব্রজে আত্মীয় ভবনে গমন কর না? না তীর্থ-দর্শন ও গঙ্গাস্নান করিবার জন্য দূরতর তীর্থ স্থানে যাইতে পাও না? কলিকাতা বা তত্তুল্য জনাকীর্ণ সমৃদ্ধ নগরীতে সর্ব্বদা একগৃহ হইতে অন্যগৃহে যাইবার সুবিধা হয় না বলিয়া সেই সেই স্থানের স্ত্রীদিগকে নিজ আবাস গৃহে থাকিতে হয় বটে কিন্তু পল্লীগ্রামের ত সেরূপ নয়। অনভিজ্ঞ গ্রন্থকারগণ তাহা না জানিয়া সর্ব্বত্রই ঐ কলিকাতার প্রথা কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যে ঐ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বিষয় পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ ইহাই আশ্চর্য্য! ইহাকেই কি ‘কাকে কান লইয়া গেল শুনিয়া নিজের কানে হাত দিয়া না দেখিয়া কাকের পশ্চাৎ দৌড়ান’ বলে না?”

রমণী।—“সত্য বটে আমরা অন্য লোকের অন্তঃপুরে যাইতে পারি, কিন্তু আমরা তোমাদের মত যেখানে সেখানে যাইতে পারি না কেন? তোমরা ত যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও! তবে আমরা যাইতে পাই না কেন? আমাকে বাজারে যাইতে দিয়া থাক? কোন প্রকাশ্য স্থানে একাকী যাইতে দেও?”

যুবক। “যে কথা বলিতে হয় একটু বিবেচনা করিয়া বলা উচিত। তা বলিলে আমরা যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারি, কিন্তু

এ কথা কি সত্য? আমরা কি অন্যের অন্তঃপুরে যাইতে পারি? আমরা যেমন স্ত্রী মহলে যাইতে পারি না, তোমরাও সেইরূপ পুরুষ মহলে যাইতে পার না। ইহাতে উভয়ের প্রতি ভিন্ন নিয়ম হইল কি প্রকারে? হাট বাজার সর্ব্বত্রই পুরুষদিগের গম্য স্থান এই জন্য সে সকল স্থানে গেলে পুরুষদিগের স্থানে যাইতে হয় বলিয়া তোমাদের সেই সেই স্থানে গমন নিষেধ। সেইরূপ যে সকল স্থানে স্ত্রীজাতি অবস্থান বা গমনাগমন করে তথায় পুরুষদিগের গমন নিষেধ। মেয়েদের ঘাটে পুরুষেরা স্নান করিতে পায় না বলিয়া কি পুরুষদিগকে আবদ্ধ বলিতে হইবে? আমি যদি স্ত্রীসমাজে নিয়ত গমন করি, তুমি আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর? আমার প্রতি কি তোমার সন্দেহ হয় না? না তাহাতে আমার চরিত্রের দোষ জন্মিবার সম্ভব হয় না? তাহা যদি হয়, তবে পুরুষসমাজে গেলে তোমার কি দোষ অর্শিবে না? যাহাই হউক এ নিয়মে ত পক্ষপাতিত্ব কিছু নাই। কেন না স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি এমন বিধান হইত যে পুরুষ ইচ্ছামত স্ত্রীসমাজে যাইতে পারে অথচ স্ত্রী পুরুষ সমাজে যাইতে পার না তাহা হইলে অবশ্যই পক্ষপাতিত্ব হইত।"

রমণী।—"ইহাই কেবল সমতা বিধায়ক হইল? দেখ দেখি তোমাদের বিচরণ-ক্ষেত্র কত প্রশস্ত আর আমাদের বিচরণ-ক্ষেত্র কত সঙ্কীর্ণ। তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পৃথিবীর পোনের আনা তোমাদের অধিকৃত ও এক আনা মাত্র আমাদের অধিকৃত। ইহাকে যদি সমতা বলে তবে জানি না বৈষম্য কাহার নাম। যৎকিৎ স্থানে আমাদিগকে আবদ্ধ

রাখিয়া সমস্ত স্থান অপনাদিগের অধিকারে রাখা কি নিতান্ত পক্ষপাতিতার কার্য্য নহে ?"

যুবক।—"আমার বোধ হয় সকল দিক্ দেখিয়া ও সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এ সকল কথা বলা হয় নাই। কেন না এক দিকে যেমন এই বৈষম্য রহিয়াছে অন্য দিকে ইহার বিপরীত বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই বৈষম্য হইতেই এই বৈষম্যের উৎপত্তি। সে বৈষম্য কি বুঝিয়াছ কি? মানবের যত কার্য্য আছে তাহার পোনের আনা কার্য্য পুরুষে করে, এক আনা মাত্র স্ত্রীজাতি সম্পন্ন করে। যাহা কিছু বলের কার্য্য, যাহা কিছু সাহসের কার্য্য, যাহা কিছু চিন্তার কার্য্য তৎসমস্তই পুরুষে সম্পন্ন করে। যে সকল কার্য্যে বিপদ সম্ভব, যাহাতে প্রাণ হানি হইতে পারে তৎসমস্তই পুরুষে সম্পন্ন করে। স্ত্রীজাতি কেবল বসিয়া বসিয়া ভোজন করে বলিলেই হয়। এই কার্য্য বা শ্রম বৈষম্য হইতেই অবস্থান স্থান বৈষম্য হইয়াছে। পুরুষদিগকে অধিকতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, সুতরাং তাহাদের অধিক স্থানের প্রয়োজন। শস্য বপনের জন্য মাঠ, বৃক্ষাদি রোপণ জন্য উদ্যান, ক্রয় বিক্রয় জন্য বিপণি, যুদ্ধ জন্য সমরক্ষেত্র, বাণিজ্য জন্য নদী ও সমুদ্র এবং অপরাপর নানা কার্য্যের জন্য রাজকীয় স্থান, রাজমার্গ, পর্ব্বত, অরণ্য ও অন্য বহুতর স্থান পুরুষদিগের প্রয়োজন। ঐ সকল স্থানে স্ত্রীদিগের কোন প্রয়োজনই নাই। এই জন্য পুরুষদিগের বিচরণ স্থান অধিক ও স্ত্রীদিগের বিচরণ স্থান অল্প। আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া স্ত্রীদিগকে কষ্ট দিবার জন্য বা আপনাদের কোন স্বার্থ সাধন করিবার জন্য পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে অল্প স্থানে আবদ্ধ করে নাই। প্রত্যুতঃ ইহাদ্বারা পুরুষের কষ্ট বাড়িয়াই পড়িয়াছে। কেননা আমাদের যে

কিছু চিন্তার কার্য্য, যে কিছু পরিশ্রমের কার্য্য, যে কিছু পরাধীনতার কার্য্য, যে কিছু জ্বালা যন্ত্রণা সমস্তই পুরুষের স্কন্ধে পড়িয়াছে, পুরুষ নিরন্তর শারীরিক ও মানসিক শ্রমে জর্জ্জরিত, তোমরা তাহাদের ছায়ায় বসিয়া সংসারের সকল যন্ত্রণার দায় এড়াইয়া উপভোগ-সুখ সম্ভোগ করিতেছ।"

কামিনী কহিলেন, "সত্য বটে তোমরা অধিক পরিশ্রম কর ও আমরা অল্প করি, কোন প্রকার সাহস বা চিন্তার কার্য্য আমাদের করিতে হয় না এবং তোমারা আমাদিগকে বিলক্ষণ যত্ন কর, কিন্তু তাহাতে কি প্রকৃত সুখ হয়? সুবর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী স্বাধীন পক্ষী হইতে সুখী অধিক, না দুঃখী অধিক? সুবর্ণ শৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নহে? আমরা যখন তোমাদের অনভিমতে কোন কার্য্য করিতে পারি না তখন আমাদিগের সুখ কোথায়? পরাধীনের আবার সুখ কি? স্বাধীনের সহস্র প্রকার দুঃখ দুঃখ বলিয়াই গণ্য নহে, যে স্বাধীনতা মানবের প্রধান সুখ, তাহা হইতে যখন আমরা বঞ্চিত তখন আর আমাদের সুখের সম্ভাবনা কোথায়?"

যুবক কহিলেন "স্বাধীনতা যে মানবের প্রধান সুখ তাহা তোমাকে কে বলিল? শিক্ষা বিভ্রাট বশতঃই তোমার এ কুসংস্কার জন্মিয়াছে। তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে নিশ্চয় জানিও মানবের ঐ সুখে আদৌ অধিকার নাই। কেননা কোন মানবই স্বাধীন নহে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ কেহই স্বাধীন নহে। মানব যদি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে মানবের অস্তিত্বই থাকে না, যদিও থাকে তাহা হইলে পশু পক্ষ্যাদি হইতে তাহার কিছু

মাত্র প্রভেদ থাকে না। পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীগণই প্রকৃতি স্বাধীন-জীব। তাহারা যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করে, কেহই তাহাদের নিবারণ কর্ত্তা নাই। তাহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, প্রতিবেশী, রাজা, প্রজা, গুরু প্রভৃতি কিছুই নাই—পরস্পরের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য নাই, সুতরাং কেহ কাহারও অধীন নয়। তাহাদের মধ্যে এক বলবানেরই কিয়ৎপরিমাণ ইতর বিশেষ আছে, তদনুসারে দুর্ব্বলেরা বলবানের নিকট পরাজিত ও বিতাড়িত হয় বটে কিন্তু কোন রূপ অধীনতা স্বীকার করে না, দুর্ব্বলেরা অন্যত্র গমন করে ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকে পরাজয় করে। কিন্তু মানবের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। মানব বাল্যকাল হইতেই অধীনতা শিক্ষা করে। সকল শিশুই পিতা মাতার একান্ত অধীন। যদি পিতা মাতা শিশু সন্তান প্রতিপালন না করেন তবে শিশু আদৌ বাঁচে না। শিশু পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির প্রণয় ও উপকার স্মরণ করিয়া বয়স হইলেও তাঁহাদের প্রণয়ের অধীন থাকে। অধীনতার প্রধান কারণই প্রণয়। প্রণয়ই পিতা মাতাকে শিশু সন্তানের অধীন করে, প্রণয়ই উপযুক্ত পুত্রকেও পিতা মাতার অধীন করে, প্রণয়ই ভ্রাতা ভগিনীকে ভ্রাতা ভগিনীর অধীন করে, প্রণয়ই স্ত্রী পুরুষকে স্ত্রী পুরুষের অধীন করে, প্রণয়ই বন্ধুকে বন্ধুর অধীন করে, প্রণয়ই প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর অধীন করে, প্রণয়ই সংসার ও সমাজের কারণ, প্রণয়ের অধীন হইয়া মানব না করে এমন কার্য্যই নাই। শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা সমস্তই প্রণয়ের নামান্তর—[illegible] ভেদে ভালবাসারই নামান্তর। যতদিন মানব প্রণয়[illegible] থাকিবে ততদিন মানব পরাধীন থাকিবে।

আরও দেখ ইতরপ্রাণীগণ যেমন প্রাকৃতিক নিয়মবলে স্বতঃ রক্ষিত হইতে পারে, মানব সেরূপ পারে না। ইতরপ্রাণীর হৃদয়ে এমত স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহা দ্বারা তাহারা স্বতঃই রক্ষিত হয়; দেখ যে দ্রব্য তাহাদের অনিষ্টকর প্রাণান্তেও তাহারা তাহা ভক্ষণ করে না। কিন্তু শিশুর নিকটে তুমি বিষ রাখ তৎ-ক্ষণাৎ সে তাহা উদরস্থ করিবে। শিশু কেন, মহাজ্ঞানবান ব্যক্তিও অজ্ঞাত বস্তুনিচয় মধ্য হইতে আপনার খাদ্য দ্রব্য চিনিয়া লইতে পারেন না, যে দ্রব্যের গুণ তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই তাহা ভাল কি মন্দ জানিতে হইলে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ কাহারও নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়। তাই মানব নিয়ত পরের শিক্ষাধীন-- জ্ঞানী, বৃদ্ধ প্রভৃতির শিক্ষার অধীন। অতএব পরাধীনতা মাত্রই যদি দুঃখের কারণ হয় তাহা হইলে মানব জন্মকেই দুঃখের কারণ বলিতে হয়,—বাল্যা-বস্থা ও অকৃত্রিম প্রণয়ীগণের অবস্থাকে অতিশয় দুঃখজনক বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ অধীনতা মানবের দুঃখের কারণ নহে—সুখেরই কারণ। তবে ইহাতেও দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেক লোক স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া বা বুঝিবার দোষে মানব-ত্বের নিদান প্রণয়াদির অপব্যবহার করে। কিন্তু এ জগতের কোন্ নিয়ম দোষসংস্পর্শ শূন্য? বিশেষতঃ এই মানবীয় শক্তির অপ-ব্যবহারে অধীনগণের যে দুঃখ হয়, তাহা তোমাদিগকে অধিক ভুগিতে হয় না, পুরুষেরাই সে কষ্ট অধিক পায়। কেন না তোমরা কেবল আপনাদের রক্ষক পুরুষেরই অধীন মাত্র; পুরুষ যে কত, লোকের অধীন তাহার শেষ নাই। যাহারা পরের চাকরী করে তাহাদের কথা ত চির প্রসিদ্ধই আছে, কুক্কুরের সহিত তাহাদের তুলনা দিয়াও লোকে তৃপ্ত হয় না। যাঁহারা প্রসিদ্ধ স্বাধীন-

বৃত্তি ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহারাও অন্য অধীনতাজনিত দুঃখ ভোগ করেন না। আমার মতে তাঁহারা চাকরদের অপেক্ষাও পরাধীন। কেননা চাকরদের কেবল একমাত্র প্রভুরই মন যোগাইলে চলে কিন্তু ব্যবসাদারদিগকে সহস্র সহস্র ব্যক্তির মন যোগাইয়া চলিতে হয়। সহস্র সহস্র লোকের সহিত তাঁহাদের কারবার করিতে হয়, তাঁহাদিগকে সেই সকলেরই মন যোগাইতে হয়, নহিলে তাঁহারা চটিয়া যান। আজিকালি ব্যবসাদারদিগের অবস্থা দেখিলে কি ব্যবসায়ের উপর বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হয় না? চাকরেরা তবু সময়ে চাটি আহার করিতে পান, কিন্তু ব্যবসাদারদিগের তাহাও ঘটে না। কোন দিন তাঁহাদের একেবারে অনাহারে কাটিয়া যায়, কোন দিন সমস্ত রাত্রিই জাগরণে অতিবাহিত হয়। কত দিন কেবল পরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ও শত শত রূঢ়-স্বভাব ও প্রবঞ্চকের উপাসনার দুঃখসম্ভোগে দিন কাটিয়া যায়। নূতন নূতন বিজ্ঞাপনের ছড়া বাঁধিতেও তাঁহাদের কম কষ্ট হয় না। "পরীক্ষা করুন, উপহার দিব, অতি সুলভ, অতি উৎকৃষ্ট, শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবে ইত্যাদি কত মিথ্যা কথা যে তাঁহাদিগকে বলিতে হয় তাহার শেষ নাই। এত করিয়াও সকলের অন্ন জুটে না, অনেকের মূলধন পর্য্যন্ত সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। পুত্র যত দিন পিতার অধীন থাকে তত দিন তাহাকে এ সকল কষ্ট পাইতে হয় না, তথাপি অনেক কুপুত্র পিতৃ শাসনকে কষ্টকর বিবেচনা করিয়া স্বাধীন হয় ও পরিশেষে আপন দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করে। পিতা মাতা পুত্রের অন্যায়াচরণ জন্য যেমন শাসন করেন ও যেমন তাহার হিতের জন্য নিয়ত তাহাকে আপন নিদেশবর্ত্তী করিয়া রাখেন, পুরুষও সেইরূপ অবলা স্ত্রীদিগের হিতের জন্য তাহা

দিগকে আপন নিদেশবর্ত্তী করেন। উহা তোমাদের শৃঙ্খল নহে, পিঞ্জরও নহে। যদি অন্য স্থান বলিয়া উহাকে পিঞ্জর বল, তাহা হইলেও পিঞ্জরের মধ্যে তোমরা স্বাধীন। তথায় তোমরা আবশ্যক সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পার। পুরুষ পিঞ্জরে বদ্ধ নহে সত্য, এবং বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত সত্য, কিন্তু তাহার হস্ত পদ লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কোনও দিকে তাহার নড়িবার যো নাই। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ মনোমুগ্ধকর পদার্থ দর্শন করিয়া তল্লাভে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। অধিকন্তু শারীরিক ও মানসিক বিবিধ কষ্ট পাইয়া তাহাদিগকে জর্জ্জরিত হইতে হয়। তোমাদের এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা নয়। বাস্তবিক তোমরা পুরুষের ন্যায় স্বাধীন হইলে তোমাদের দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি ভিন্ন অল্প হইবে না। আমি—”

যুবতী যখন এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখভঙ্গীতে একরূপ হাস্য মিশ্রিত ব্যঙ্গভাব প্রকাশ হইতেছিল। যুবকের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, এ বড় মজার কথা! “ছাগল বলে আমি প্রাণে মলাম, গৃহী বলে আমি আলুনি খেলাম” আমরা বলি আমারা অধীনে থাকিয়া পুরুষদিগের অত্যাচারে জ্বালাতন হইতেছি তোমরা বল স্ত্রীজাতি সুখে আছে, পুরুষেরা স্ত্রীজাতীর সুখ-বিধানের জন্য লালায়িত। মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া থাকি কোন কোন রাজপুরুষ বলেন ভারতবাসীর হিতের জন্যই বিদেশীয়গণ ভারতরাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। তোমার মুখেও তদনুরূপ বাক্য শুনিতেছি। কিন্তু কেন? কে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তোমাদের দেশে গিয়া খোসামোদ করিয়াছিল তাই তোমরা সদয়চিত্তে আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য ভারত অধিকার করিয়াছ! আর পুরুষ!

তোমাদিগকেও বলি, কোন্ নারী তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিল যে আমরা হাটে বাজারে যাইতে পারি না, উপার্জন করিতে পারি না, তোমরা আমাদিগকে ঘরে পুরিয়া রাখ ও আমাদিগকে চাট্টি করিয়া খাইতে দাও? তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি আর আমাদের হিত করিও না, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আমরা দুঃখ পাই আমরা পাইব. তোমাদের সে ভাবনা কেন? কথায় বলে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।"

যুবক গম্ভীর স্বরে কহিলেন "প্রিয়তমে! সত্য সত্যই তোমাদের স্বাধীন হইবার ইচ্ছা হইয়াছে? সত্য সত্যই মনে করিয়াছ. তাহা হইলে তোমারা সুখী হইবে? তাহা যদি ভাবিয়া থাক তবে আমি বলিতেছি এই মুহুর্ত্ত হইতে তুমি স্বাধীন হও, আমি অধীন হই। সংযুক্তি তুমি আর বুঝিবে না; পাশ্চাত্য শিক্ষার যে শ্রবণমনোহর ঝঙ্কার তোমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে ও তদবলম্বনে যে লোভনীয় মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছ কথার বিচারে তাহা তোমার নষ্ট হইবে না—মৃগতৃষ্ণিকা বলিয়া তোমার বোধ হইবে না সুতরাং আর আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিব না—এরূপ অবস্থায় ঠেকে শেখার প্রয়োজন! ঈশ্বর তুমিই তোমার সৃষ্টির ভাবনা ভবিবে। আমি একটু নিদ্রা অনুভব করি। অদ্য হইতে তোমরা স্বাধীন হও অর্থাৎ তোমরা পুরুষের পদ গ্রহণ কর ও আমরা স্ত্রীর পদ গ্রহণ করি।"

যুবতী হাস্য-গদ্গদ্স্বরে কহিলেন "পুরুষরত্ন! সত্যই কি আমাদিগকে মুক্ত করিলে, তবে এখন আমরা বাহিরে যাই?" যুবক "তথাস্তু" বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং যুবতী বহির্দ্বার উন্মোচন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রথম দৃশ্য।

যুবক যুবতী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলে শূন্যগৃহ আমার নয়ন সমক্ষে অতি অল্পক্ষণমাত্র প্রতিভাত হইয়াছিল। অবিলম্বেই আমি যাহা দেখিলাম তাহা অতি বিস্ময়কর। আমি যে কোথায় আছি তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না—কখনও নিবিড় অরণ্য, কখনও বিশাল সমুদ্র, কখনও উচ্চ শৈলমালা, কখনও সুবিস্তৃত প্রান্তর, কখনও জনাকীর্ণ বিপণী, কখনও সুরম্য হর্ম্ম্যপূর্ণ নগরী ও কখনও তৃণলতাশূন্য মরুভূমি আমার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। আমার বোধ হইল যেন একটী বিশ্ব-দর্শন যন্ত্র আমার সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে, উহার পরিচালন অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত স্থান পর্য্যায় ক্রমে আমার নয়ন পথবর্ত্তী হইতেছে। আমি এককালে পৃথিবীর নানারূপ শোভা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলাম। আরও চমৎকার এই যে, আমি যেখানে নয়ন নিক্ষেপ করি সর্ব্বত্রই অসূর্য্যম্পশ্যা স্ত্রীজাতিই আমার দর্শনপথবর্ত্তিনী হইল, হীনজাতীয় পুরুষ দুই চারি জন স্ত্রীদিগের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু কোনও প্রকাশ্য স্থানেই ভদ্র পুরুষ নয়নগোচর হইল না। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি এককালে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম, বিশেষতঃ নারীগণকে যে অবস্থা-সম্পন্ন দেখিলাম তাহাতে আমার বিস্ময় দ্বিগুণিত হইয়া-পড়িল। তাহাদিগকে আর আমার পূর্ব্বপরিচিত নারী বলিয়াই প্রতীতি হইল না। তাহাদের সে কমনীয় কান্তি নাই, সৌন্দর্য্যের মূলাধার সে লজ্জা নাই, মহত্ত্বব্যঞ্জক সে ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া ও বিনয় নাই, শরীরের সে কোমলতা বা লাবণ্য নাই, বর্ণের সে উজ্জ্বলতা নাই, অঙ্গে সে অলঙ্কার নাই, মুখের সে

প্রফুল্লতা নাই, দেখিলে বোধ হয় যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীই আজি বিধবা হইয়াছে। বাস্তবিক অনাথার ন্যায় তাহারা পেটের দায়ে নিয়ত ভয়ানক পরিশ্রম করিতেছে। অবস্থা অনুসারে কেহ হলচালন ও কেহ শকট বাহন করিতেছে, কেহ মৃত্তিকা খনন করিতেছে, কেহ ভার বহন ও কেহ যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেছে, কেহ সমুদ্র মধ্যে অর্ণবযান ও নদীমধ্যে পোত বাহন করিতেছে, কেহ বণিক কৌশল প্রকাশ করিতেছে, কেহ বিচারাসনে বসিয়া বিচার কার্য্য করিতেছে; কেহ আফিসে বসিয়া কেরাণির কার্য্য করিতছে, কেহ পুস্তক হস্তে লইয়া ধীরগম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছে, কেহ দেশের উন্নতি সাধন জন্য সভা গৃহে ও পথে পথে বক্তৃতা করিতেছে ও কেহ ব্রাহ্ম সমাজে বসিয়া মুদিত নয়নে উপাসনা ও ব্রহ্মগীত গান করিতেছে। পুরুষের সকল কার্য্যই নারীজাতি সম্পাদন করিতেছে। দেখিয়া বোধ হইল বিধাতা বুঝি পুরুষদিগের আকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন, অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া পুরুষ কুল ধ্বংশ করিয়া তং স্থানে নারী বসাইয়াছেন। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছুই স্থির হইল না। পুরুষজাতি যে কোথায় চলিয়া গেল, কি প্রকারে তাহাদের সত্ত্বার লোপ হইল কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার ভাবিলাম "বড় বাড়িলে ঝড়ে ভাঙ্গে" এই কথা বুঝি ঠিক হইল। পুরুষজাতি স্ত্রী-জাতিকে অধীন করিয়া বড়ই পাপ করিয়াছিল ও আপনাদিগের স্বার্থসাধন জন্য তাহাদিগকে বড়ই দুঃখ দিবার চেষ্টা করিয়াছিল সেই পাপে বুঝি বিধাতা পুরুষের উপর কুপিত হইয়া তাহার ধ্বংস করিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এক কালে সমস্ত পুরুষের লোপ সাধন কি প্রণালীতে হইল? বিজ্ঞানশাস্ত্র কি

সম্পূর্ণ মিথ্যা? স্ত্রীর লোপ না হইয়া কেবল পুরুষের লোপ হইতে পারে এমত কোনও উপায় ত বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনে পাওয়া যায় না. সুতরাং তাহা অসম্ভব। এক বার মনে হইল আধুনিক স্ত্রীজাতির বাড়াবাড়ি দেখিয়া বুঝি পুরুষগণ লজ্জা বা মনের দুঃখে দেশান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ দেশে গেল? আমি ত সকল দেশই দেখিলাম, কোনও দেশেই ত পুরুষের অস্তিত্ব লক্ষিত হইল না। এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সহসা অন্তঃপুরের দিকে নয়ন পতিত হইল, কিন্তু অভ্যাস বশতঃ আমার নয়ন সে দিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। পরনারীদর্শন অন্যায় বোধে আমি সে দিক্ হইতে নয়ন ফিরাইলাম! কিন্তু তখনই মনে হইল যে এক্ষণে অন্তঃপুর হইতে নয়নাকর্ষণ করার কারণ কি? অন্তঃপুর মধ্যে নারীগণ অসাবধানে বাস করে ও পরস্পর বিশ্রব্ধ আলাপ করে, ভদ্রলোকের পরনারীর এরূপ অবস্থা অবলোকন করা উচিত নয় বিবেচনায় অন্তঃপুর মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতাম না। কিন্তু এক্ষণে ত আর স্ত্রীজাতি অন্তঃপুরে নাই, তবে অন্তঃপুর দর্শনে দোষ কি? এই ভাবিয়া অন্তঃপুর মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিবামাত্র দেখিলাম পূর্ব্বে অন্তঃপুরের যেরূপ অবস্থা ছিল এখনও ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে। অর্থাৎ অন্তঃপুর সকল পূর্ব্ববৎ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত ও বিশেষরূপে সুরক্ষিত আছে। মনে করিলাম ইহার কারণ কি? কেন অন্তঃপুর সুরক্ষিত রহিয়াছে? যে রমণীদিগের কারাগার স্বরূপে অন্তঃপুরের আবশ্যক সেই রমণীগণ যখন মুক্ত ও স্বাধীন ও যখন পুরুষের অস্তিত্বমাত্র নাই তখন অন্তঃপুরের আবশ্যক কি? যখন বন্দী নাই তখন কারাগৃহের আবশ্যকতা কোথায়? কে কাহার জন্য কারাগৃহ

রক্ষা করিল? এই ভাবিতে ভাবিতে অন্তঃপুর মধ্যে নয়ন নিক্ষেপ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে শরীর রোমাঞ্চিত হইল! দেখিলাম রমণীগণের পরিবর্ত্তে পুরুষগণ অন্তঃপুরে অবস্থিত। দেখিতে দেখিতে সমস্ত অন্তঃপুরই আমার নয়ন সমক্ষে উপনীত হইল। দেখিলাম পুরুষগণ কেহ রন্ধন করিতেছে, কেহ গৃহমার্জ্জন করিতেছে, কেহ বসিয়া বসিয়া গোঁপে তা দিতেছে, কেহ কিরূপ অলঙ্কার পরিলে শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তাহার চিন্তা করিতেছে ও কেহ হাত নাড়িয়া ঝগড়া করিতেছে। দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম উচিত শাস্তি হইয়াছে। যেমন প্রভুত্ব তেমনি অধীনত্ব। পুরুষ যেমন বাড়াবাড়ি করিয়াছিল তাহার উচিত শাস্তি হইয়াছে। ঐ সময়ে আমার মনে হইল স্ত্রীর এই বিজয় কি তাহাদের আপন ক্ষমতায় হইয়াছে? তাহা যদি হইয়া থাকে তবে যে ভাবিতাম স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্ব্বলা তাহা ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক! অথবা পুরুষ ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছে? কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সবল কি কখনও ইচ্ছা পূর্ব্বক দুর্ব্বলের অধীনত্ব স্বীকার করে? তাহা যদি হয় তথাপিও বলিতে হইবে অবশ্য পুরুষের শক্তিতে হীনতা আছে। বাস্তবিকই পুরুষশক্তিতে হীনতা আছে, নচেৎ যখন তাহারা স্ত্রীকে আপনার সম্পূর্ণ অধীনে রাখিয়াছিল তখনও স্ত্রীর পদে মস্তকার্পণ করিত কেন এবং যাহারা স্ত্রীদিগকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিত তাহারা উন্নতিশীল (Liberal) নামই বা প্রাপ্ত হইত কেন? শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই রমণীগত প্রাণ কেন? শিশুগণ মাতৃপরায়ণ, যুবাগণ স্ত্রীপরায়ণ, বৃদ্ধগণ কন্যা পরায়ণ। রমণীর পরিচর্য্যা, রমণীর মধুর ভাষণ, রমণীর অধীনতা

পুরুষের একমাত্র অভিলষণীয়, তাই বুঝি আজি পুরুষ সর্ব্ব-প্রকারে রমণীর অধীন হইয়া সম্পূর্ণ-সুখ সম্ভোগ করিতেছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সেই যুবকযুবতীর কথোপকথন ও তাহাদের পরস্পরের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা স্মরণ হইল। তখন ভাবিলাম ঐ পুরুষ পুরুষসম্প্রদায় জ্ঞাপক ও ঐ স্ত্রী সমগ্র স্ত্রীসম্প্রদায় জ্ঞাপক হইবে। যাহাই হউক এক্ষণে পৃথিবীর কার্য্য কিরূপ চলিতেছে অর্থাৎ স্ত্রী বিষয়-কার্য্য ও পুরুষ অন্তঃপুরের কার্য্য কিরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেছে দেখা আবশ্যক।

এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে যেন আমি এক বৃহৎ শস্যক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। ভাদ্র মাস, কোন স্থানে আশু ধান্য সকল পরিপক্ক হইয়া নত হইয়া পড়িয়াছে, কোন স্থানে আমন ধান্য রোপিত হইতেছে, কোন স্থানে রবিখন্দের জন্য ভূমি কর্ষিত হইতেছে ও কোনও স্থানে ধান্য ও পাট-সূত্রবৃক্ষ সকল ছেদিত হইতেছে। সকল কার্য্যই রমণীদ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। হলকর্ষণ, ধান্যচ্ছেদন ও রোপণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নারীগণ সম্পাদন করিতেছে। যে সকল যুবতী অন্তঃপুর আলোকিত করিত, যাহাদের শরীর অতি কোমল ছিল, যাহাদের লাবণ্য অনুপমেয় ছিল তাহারা এক্ষণে রৌদ্র-তাপে ক্লিষ্ট হইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, দৃঢ় হলমুষ্টি ধারণ ও কঠিন মৃত্তিকায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া কঠিনাঙ্গী হইয়াছে। তাহাদের সে রূপ নাই, সে কোমলতা নাই, সে কমনীয়তা নাই। যে দয়া ও স্নেহগুণে নারীজাতি স্বর্গীয়জীব ছিল সে দয়া মমতা আর তাহাদের কিছুমাত্র নাই। দৃঢ় পরিশ্রম সহকারে তাহারা হল-চালনা ও মৃত্তিকা খননাদি করিতেছে, নিকটে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সন্তানগণ স্তন্যপান করিবার

জন্য ক্রন্দন করিতেছে, মাতাগণ দেখিয়াও দেখিতেছে না, শুনিয়াও শুনিতেছে না। যখন শিশুগণ মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছে তখনই এক একবার তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যদান করিতেছে এবং ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পুরুষ জাতির প্রতি গালিবর্ষণ করিতেছে। বলিতেছে "পুরুষগণ কেবল বসিয়া বসিয়া আহার করিবেন আর আমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া দিব; ছেলেগুলাকেও শান্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। যদি কখনও ছেলেদের বাটী রাখিয়া ক্ষেত্রে আগমন করি, তখনই পাঠাইয়া দেয়, বলে স্তন্য ব্যতিরেকে শান্ত হয় না—কেন, তোমরা স্তন্যদান করিতে পার না? তবে তোমাদের কি শক্তি আছে? কেবল হুকুম চালাইবারই ক্ষমতা আছে? একটু ক্রেটী হইলেই রাগে গরগরে হইবার ত শক্তি খুব আছে; থাল পুরিয়া অন্ন খাইবারও শক্তি ও ত কম নয়!

এক স্থানে দেখি একটী পূর্ণগর্ব্ভা যুবতী হল চালন করিতেছে, এমন সময় তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। নিদারুণ গর্ব্ভ যন্ত্রণায় তাহাকে অভিভূত ও মৃতের ন্যায় করিল। বিস্তীর্ণ মাঠের অনাবৃত স্থানে রৌদ্রের ভয়ানক উত্তাপে সেই পূর্ণগর্ব্ভা যুবতী গর্ব্ভ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে; ধাত্রী নাই, কোন সহায় নাই, দারুণ যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। পরিশেষে সেই ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। ক্ষেত্রস্থ কএকজন কৃষাণী আসিয়া জল সিঞ্চন করিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে যুবতী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল "ঈশ্বর তুমি কি জন্য নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছ নারীকে এ ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়া তোমার কি ইষ্ট সাধিত হইতেছে?

অকর্ম্মা পুরুষজাতি তোদের জ্বালাতেই আমরা অস্থির হইয়াছি। তোদের যদি পুষিতে না হইত তাহা হইলে আমাদের কোন কষ্টই থাকিত না। ছেলে পিলে সংসার কোন দায়েই ঠেকিতে হইত না। এ গর্ভযন্ত্রণাও উপস্থিত হইত না। কল্য খাজনার জন্য জমীদারের পেয়াদা আসিয়া কি কষ্ট দিল তাহা মনে করিলে প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হয় না। ঘরে খাবার না থাকায় ছেলেগুলির কষ্ট দেখিতে পারা যায় না, এ দিকে ক্ষেত্রে যে শস্য হয় তাহা খাইতে গেলে রাজস্ব কুলায় না, রাজস্ব দিলে খাবার কুলায় না। এত পরিশ্রম করিতেছি তথাপি কিছুই করিতে পারিতেছি না। এখন উপায় কি! এখন যদি প্রাণ যায় তাহা হইলেই মঙ্গল, নচেৎ উপায় কি হইবে? এরূপ অবস্থায় কি আমি শীঘ্র কার্য্য করিতে পারিব? কখনই না! কিন্তু তাহা হইলে খাইব কি? ছেলেরা কোথায় যাইবে? হে জগদীশ্বর আমার প্রাণ গ্রহণ করিয়া এ কষ্টের শান্তি কর!' এইরূপ বলিতে বলিতে পুনরায় মুর্চ্ছিত হইল, আর জাগিল না।

শস্যক্ষেত্রে এইরূপ যে কত দুঃখবহ ঘটনা দেখিলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কোনও স্থানে কোন রমণী বাধকবেদনায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার গরুগুলি ছাড়া পাইয়া পলাইতেছে; কোনও স্থানে দেখিলাম কোনও রমণী অল্পবয়স্কা শিশুকে কিঞ্চিৎ দূরে শয়ন করাইয়া নিবিষ্ট মনে হলকর্ষণ করিতেছিল ঐ শিশু জাগরিত হইয়া হামা দিয়া মাতৃ সন্নিধানে যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, জননী তাহা জানিতে না পারায় হলের দিক্-পরিবর্ত্তন কালে বলীবর্দ্দদ্বয়যুক্ত হল ঐ শিশুর উপর পরিচালিত করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিল। এই সকল ও অন্যান্যরূপ নানাবিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিতে দেখিতে

আমার ইন্দ্রিয় সকল শক্তিশূন্য হইল, চক্ষু দিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অন্তরাত্মা আরও অন্তরে প্রবেশ করিল।

এরূপ নিস্পন্দ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। যখন জ্ঞানসঞ্চার হইল দেখিলাম আমি একটী বৃহৎ নগরে প্রবেশ করিয়াছি। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃহৎ অট্টালিকা শ্রেণী, গাড়ি পাল্কি ও মনুষ্যে রাস্তা পরিপূর্ণ। সে স্থানের শোভা বর্ণন করিবার অধিক প্রয়োজন নাই। কেন না যখন ভাল করিয়া দেখিলাম তখন জানিলাম আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। সেখানেও দেখিলাম সমস্ত কার্য্য নারীদ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। রমণীগণ কেহ মোট বহন করিতেছে, কেহ শকট চালাইতেছে, কেহ রাস্তায় জল দিতেছে, কেহ ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, কেহ আফিসে যাইতেছে। আমি একটী রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী আফিসে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সারি সারি যুবতী-গণ লিখিতে বসিয়াছে; কেহ নকল করিতেছে, কেহ হিসাব করিতেছে, কেহ ভুল ধরিতেছে, এইরূপ নানা জনে নানা প্রকার কার্য্য করিতেছে। একটী যুবতী ঘরে অন্ন নাই দেখিয়া প্রাতে Extra খাটিতে আসিয়াছিল, সে কার্য্য ফুরাণ করিয়া লইয়াছিল। সে অতি প্রত্যূষে আসিয়া বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত অনাহারে অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত লিখিয়াছিল, পাছে কার্য্য অল্প হয় এই আশঙ্কায় যুবতী পার্শ্ববর্ত্তী রোরুদ্যমান শিশু সন্তানকে একবারও স্তন্য প্রদান করে নাই। শিশু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল, আছাড়ি পাছাড়ি করিল, কিছুতেই যখন দেখিল মাতা তাহার প্রতি সদয় হইলেন না তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহার মাতাকে প্রহার করিতে লাগিল। জননীর তখন লেখা শেষ হইয়াছিল, কাগজগুলি গুছাইতেছিলেন শিশুর

প্রহারে হস্ত কম্পিত হওয়ায় কাগজগুলি হস্তস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। শিশু ঐ কাগজগুলি পড়িবামাত্র হস্তদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। একে ঘরে অন্ন নাই সেই কষ্ট, তাহাতে এত পরিশ্রম করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা এক-কালে নষ্ট হইল, রমণী অধীরা হইলেন, পার্শ্বে একগাছি রুল ছিল সেই রুলদ্বারা শিশুকে সজোরে আঘাত করিলেন। প্রচণ্ডাঘাতে শিশু তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই পৈশাচিক ব্যাপার দেখিয়া আর আমি তথায় থাকিতে পারিলাম না, প্রস্থান করিলাম। তথা হইতে একটী গবর্ণমেণ্ট আফিসে গেলাম। সেখানে দেখিলাম কেরণিনীগণ সমবেত হইয়া প্রধান কর্ম্মচারিণীর নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উৎসুক চিত্তে তাহাদের কথোপকথন শুনিলাম। তাহাতে জানিলাম তাহারা আবেদন করিয়াছিল যে, শিশু-সন্তানগণ নিয়ত কার্য্যের ক্ষতি করে, বাটীতেও তাহাদের রাখিয়া আশা যায় না, কেননা তাহাদের স্তন্য প্রদান আবশ্যক, এই জন্য তাহারা প্রার্থনা করে যে, তাহাদের এরূপ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক যে, তদ্দ্বারা তাহারা একটী করিয়া ধাত্রী রাখিতে পারে, অথবা আফিসে এমন কয়েক জন ধাত্রী ও চাকরাণী রাখা হউক যে তাহারা পর্য্যায়ক্রমে সকল শিশু সন্তান গুলির রক্ষণ ও স্তন্য দান করিতে পারে। তাহাদের আরও প্রার্থনাছিল যে, পূর্ণ গর্ভাবস্থায় রমণীগণ যেন অন্ততঃ একমাস ছুটী পায়। ঐ আবেদনের হুকুম আসিয়াছিল যে, সর্ব্বত্রই ঐরূপ করিতে হইলে এত ব্যয় বৃদ্ধি হইবে যে, তজ্জন্য নূতন টাক্স ধার্য্য না করিলে কিছুতেই ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে না। অতএব ব্যবস্থাপক সভায় সত্বর ইহার আন্দোলন করিয়া পরে প্রত্যুত্তর দেওয়া

যাইবে। ঐ হুকুম শুনিবার জন্য সমস্ত কেরাণিনীগণ প্রধান কর্ম্মচারিণীর আফিসে সমবেত হইয়াছিল। ঐ হুকুমে কোন রমণী সন্তুষ্ট হইল না দেখিয়া আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

আমি তথা হইতে এককালে চিতপুর রোডে আসিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম তথায় রাস্তার দুধারে বিপণীশ্রেণী শোভা পাইতেছে ও রমণীগণ তথায় ক্রয় বিক্রয় করিতেছে; কিন্তু ছেলে গুলা দ্রব্য সামগ্রী গুলীন এমন এলোমেলো ও নষ্ট করিতেছে যে, তাহাতে তাহাদের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। একটী কুম্ভকারের দোকানে হাঁড়ি কলসী সাজান ছিল, একটী দুগ্ধপোষ্য শিশু নিচের একটী হাঁড়ি টানিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলাতে উপর হইতে সমস্ত হাঁড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল ও ঐ শিশুর গাত্রোপরি আবৃত হইয়া পড়িল। একটী ময়রার দোকানে ময়রা সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া খোলা নামাইয়া রাখিয়াছে, একটী শিশু মূত্রত্যাগ করিয়া ঐ খোলা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। একটী ঘড়ীর দোকানে একটী বালক অন্যূন সহস্র মুদ্রার ঘড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এইরূপে প্রায় প্রত্যেক দোকানেই দেখিলাম শিশুর অত্যাচারে ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগে কাপড় প্রভৃতি নষ্ট করিতেছে এবং লোষ্ট্র-নিক্ষেপে ও নিজে পতিত হইয়া নানাবিধ দ্রব্য ভগ্ন করিতেছে। জননীগণ এক একবার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ছেলে-দিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছেন, কিন্তু যখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে তখন আবার বন্ধন মোচন করিয়া দিতে হইতেছে। আমি এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিতে করিতে এক বার মেছুয়া বাজারের দ্বিতীয়তল গৃহে দৃষ্টিপাত

করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য। তথায় যুবকগণ বিবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া রাস্তায় যুবতীদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের ভাব দেখিলে বুঝা যায় যেন তাহারা কটাক্ষ নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে। বলিতে পারি না তাহাতে রমণীর মন ভুলিতেছে কি না, কিন্তু আমার তাহা দেখিয়া বড় হাসি পাইল। আমি উহাদের কাণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হইতে একটু বিলম্ব আছে দেখিয়া ভাবিলাম এক বার এই সময়ে বীডন-গার্ডন ভ্রমণ করিয়া আসি।

বীডন গার্ডনে প্রবেশ করিবা মাত্র মনঃ প্রাণ জুড়াইয়া গেল, বোধ হইল যেন গোলকধামে আসিয়াছি অথবা শ্রীবৃন্দাবনের নবদৃশ্য দেখিতেছি। যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম বীডন পার্ক বুঝি, চাঁদের গাছে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সকল গাছেই অগণিত চন্দ্রফুল ফুটিয়াছে; অথবা যদি কবিবর শ্রীহর্ষের ন্যায় রচনাশক্তি থাকিত তাহা হইলেও বলিতাম চন্দ্রমণ্ডল আকাশ হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ স্থানে পতিত হইয়া শতধা হইয়াছে ও প্রত্যেক খণ্ডই নবনিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ উদ্যানের অতি চমৎকার শোভা হইয়াছে, সহস্র সহস্র সুন্দরী রমণী নানাবিধ বেশ বিন্যাস করিয়া হাস্যবদনে ভ্রমণ করিতেছে। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই মহানন্দে ভ্রমণ করিতেছে। প্রথমে তাহাদিগকে স্ত্রী জাতি বলিয়াই বুঝিতে পারি নাই—ভাবিলাম গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতির কথা যে, পুরাণাদিতে পাঠ করিয়াছি, তাহাই বুঝি প্রত্যক্ষ করিলাম। সকলেরই পুরুষ বেশ বটে কিন্তু সে বেশের নূতনত্ব ও বৈচিত্র আছে। কেশদামের পারিপাট্য অতি

চমৎকার। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন রকমের তেড়ি। কেহ কেশগুচ্ছ ছেদন করিয়াছেন, কেহ কিয়দংশ কেশ দুই দিক্ দিয়া নামাইয়া দিয়া গোঁপ দাড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন, কেহ বেণী বন্ধন করিয়া মস্তকের উপরিভাগে উষ্ণীষ প্রস্তুত করিয়াছেন, কেহ বাম ও কেহ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া চূড়া বন্ধন করিয়াছেন। কেহ বিবিধ পুষ্প ও কেহ সুবর্ণালঙ্কার দ্বারা মস্তক সুশোভিত করিয়াছেন। দেখিলাম পুরুষ সাজিয়াও তাঁহারা অলঙ্কারপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক অঙ্গুলীতে রকম রকমের অঙ্গুরীয় পরিয়াছেন, স্থূল হার গুচ্ছে ঘড়ি ঝুলাইয়াছেন। কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা সকলেরই সজ্জা সমান, বৃদ্ধা-দের আরও অধিক। তাঁহারা কলপ দিয়া শ্বেত কেশ কৃষ্ণ করি-য়াছেন, মলম বিশেষ দ্বায়া পলিত চর্ম্ম মসৃণ করিয়াছেন ও বস্ত্রাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল যুবতীযোগ্য করিয়াছেন। অল্প বয়স্ক পুরুষদের সহিত তাঁহাদের আমোদ কিছু অধিক। সকলে যে কেবল ভ্রমণ করিতেছেন এমত নহে, কেহ ক্রীড়া করিতেছেন, কেহ তর্ক করিতেছেন, কেহ বক্তৃতা শুনিতেছেন, কেহ সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে মন্দমন্দ ভ্রমণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি উপাসকগণ আপন আপন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, সকল ধর্ম্ম প্রচারকেরই চতুর্দ্দিক বহুতর লোক ঘিরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু প্রচারকের চতুর্দ্দিকে সেরূপ লোক নাই, যে দুই চারি জন আছে তাহারা কেবল তাঁহাকে বিদ্রূপই করিতেছে। কেহ বলিতেছে যে ধর্ম্মশাস্ত্র মতে "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" সে ধর্ম্মশাস্ত্র যত সত্য তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, আবার কি আমাদিগকে ঐ মত অবলম্বনে বাঁধা দিতে হইবে না কি? ভগিনি! তোমার শাস্ত্র লইয়া তুমি ঘরে যাও।

কেহ বলিতেছে কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দাও, কেহ বলিতেছে না ঐ শাস্ত্র এখনই পুড়াইয়া ফেলিয়া দাও, কি জানি যদি কাল মাহাত্ম্যে উহার 'নব জীবন' প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। ভাগ্যে ইংরাজগণ এ দেশে আসিয়া সাম্যতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাই আজি আমাদের এই উন্নতি, নচেৎ হিন্দুর আশ্রয়ে থাকিলে এত দিন স্ত্রীজাতির অস্তিত্বই থাকিত কি না সন্দেহ। হিন্দু প্রচারিকা ঐ সকল কথার উত্তর দিতেছেন এবং বলিতেছেন স্ত্রীর আধিপত্যের কথা ত শাস্ত্রে লেখা আছে। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে কলিকালে পুরুষগণ স্ত্রীর অধীন হইবে—স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবে, স্ত্রী যাহা বলিবে পুরুষ তাহাই করিবে, তাই আজি পুরুষ অধীন ও স্ত্রী স্বাধীন। ফরাসি দার্শনিক কমটি সেই কথা শুনিয়া স্ত্রীকে প্রকৃত দেবতা বলিয়াছিলেন। এখন সত্য সত্যই স্ত্রী পুরুষের প্রভু ও দেবতা হইয়াছে। অতএব হিন্দুধর্ম্মকে অসত্য বলা নিতান্ত অন্যায়। তবে যে কলিকালকে অপকৃষ্ট ও সত্যকালকে উৎকৃষ্ট বলে সে প্রকৃত শাস্ত্রের কথা নহে, উহা প্রবঞ্চক পুরুষদিগের কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত। হিন্দু শাস্ত্র যে সকল ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, সকল শাস্ত্রেরই মতে পরমেশ্বর পুরুষ—যাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারাও তাঁহাকে পুরুষভাবে দেখেন, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র সে অসম্ভব কথা কথা বলে না, হিন্দু শাস্ত্র মতে রমণী অর্থাৎ আদ্যাশক্তি কালীই বিশ্বের পরমেশ্বরী।

এক স্থানে একজন বৈজ্ঞানিক স্ত্রীজাতি যে ঈশ্বরের সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে,

স্ত্রীজাতি সকল পদার্থের ও সকল জীবের শ্রেষ্ঠ। কেন না শ্রেষ্ঠ পদার্থের উদ্ভব প্রথমে হয় না এবং যখন তাহার প্রথম উদ্ভব হয়, তখন তাহা নিকৃষ্ট পদার্থের অধীন থাকে। দেখ আকাশ হইতে বায়ু শ্রেষ্ঠ, বায়ু হইতে জল শ্রেষ্ঠ, জল হইতে মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ, মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ্ শ্রেষ্ঠ, উদ্ভিদ্ হইতে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, ইতর প্রাণী হইতে মানব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দেখ শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকল পরে পরে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যখন প্রথমে অল্প বায়ু ছিল, তখন বায়ু আকাশের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিত না—ঐরূপ জল বায়ুর ও মৃত্তিকা জলের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিত না। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, বন্যাবস্থায় মানব পশ্বাদির পরাক্রম সহ্য করিতে পারিত না। ক্রমে মানব যত উন্নত হইতে লাগিল ততই পশুগণ মানবের আয়ত্ত হইল—ভয়ানক হিংস্র ও পরাক্রান্ত জীবগণও মানবের সম্পূর্ণ অধীন হইল। ঐরূপ স্ত্রীগণ প্রথমাবস্থায় পুরুষের অধীন ছিল, কিন্তু তাহারা যখন উন্নীত হইল তখন তাহারা পুরুষকে অধীন করিতে লাগিল ও ক্রমে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। অতএব রমণীগণ! চেষ্টা কর তাহা হইলে উন্নতির শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইবে। এখন তোমাদের যে সকল কষ্ট আছে তৎসমস্তই দূরীভূত হইবে। পুরুষ ক্রমটিই বলিয়াছেন কালে স্ত্রীজাতির গর্ভ ভিন্ন সন্তান জন্মিবে।' সুতরাং তোমারা চেষ্টা কর তোমাদের গর্ভধারণ করিতে হইবে না, সন্তান পালন করিতে হইবে না, স্তন্য দান করিতে হইবে না। ঐ সকল কার্য্যই পুরুষের স্কন্ধে ফেলিতে পারিবে। মনে কর দেখি সে দিন কি সুখের দিন হইবে যে দিন পুরুষগণ গর্ব্ভধারণ করিবে, সন্তান পালন করিবে, স্তন্য

দান করিবে, সংসারের সমস্ত কার্য্য করিবে, আর আমরা গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইব। ভগিনীগণ! গর্ভযন্ত্রণা এখন আমাদের বড় ভয়ের কারণ হইয়াছে। যখন নারী অধীন ছিল তখন সহ্য করা তাহার অভ্যাস হইয়াছিল। এখন আমরা স্বাধীন, এখন আমরা ক্লেশ সহ্য করিতে পারিব কি প্রকারে? "বেঁধে মারে সয় ভাল" তাই তখন নারী সহ্যগুণে বিখ্যাত ছিল। এখন আমাদিগকে নানাবিধ চিন্তা ও নানাবিধ কার্য্য করিতে হয়, এখন আমরা বৃথা যন্ত্রণা সহিতে পারিব কেন? আমরা জগতের শ্রেষ্ঠজীব, এখন আমরা যদি কষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া কার্য্য করিতে না পারি, যদি সন্তান পালনরূপ সামান্য কার্য্য করিতে আমাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট হয়, তবে পৃথিবীর উন্নতি হইবে কি প্রকারে? যত আমরা সাংসারিক কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিব ততই আমাদের শরীর ও মন সুস্থ থাকিবে. ততই জগতের কার্য্য করিতে পারিব। অচিরে মাটির জগৎ সোণার হইবে, সমগ্র পৃথিবী অট্টালিকায় পূর্ণ হইবে। তখন আর শস্য বপনাদি করিতে হইবে না, মিঠাই মোণ্ডার ন্যায় অন্নও শিল্প কৌশলে প্রস্তুত হইবে, শিল্প কার্য্যের জন্যও আমাদিগকে তখন কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হইবে না। সমস্তই কলে তৈয়ার হইবে, এমন কি আমাদের আহার বিহারাদিও কলে সম্পন্ন হইবে। তখন আমাদের সুখের সীমা থাকিবে না। অতএব ভগিনীগণ! কায়মনোবাক্যে পৃথিবীর উন্নতি বিধানে যত্নবতী হও, উহাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। সর্ব্বকারণ-ভূতা পরমেশ্বরী উহারই জন্য আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। উন্নতিসাধন করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ঐ কার্য্যের জন্য উপযোগী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের কর্ত্তব্য

যাহাতে পুরুষ গর্ভধারণ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা। তাহারা কেবল ঘরে বসিয়া ভোজন করে, তাহাদেরই ঐ সকল কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক। তাহাদের কোন কঠিন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয় না, তাহারা সন্তান প্রসব করুক, সন্তান পালন করুক, সহ্য করিতে শিখুক, লজ্জা, দয়া, স্নেহ প্রভৃতি দুর্ব্বল প্রকৃতির উপযোগী গুণে তাহারাই ভূষিত হউক। ভগিনীগণ! এ সকল অসম্ভব মনে করিও না। মানবের বুদ্ধি-বলে সকলই সম্ভব। দেখ বুদ্ধিবলে মানব পক্ষী অপেক্ষাও সুখে আকাশমার্গে উড়িতেছে, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকেও বশে আনিতেছে, বুদ্ধিবলে মানব হিংস্রের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কলম করিয়া কুল গাছে আমড়া ফলাইতেছে, তবে কেন পুরুষের স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে না? অবশ্য পারিবে। অতএব যদি জগতের হিতকামনা করা কর্ত্তব্য হয় তবে সকলে কায়মনোবাক্যে যত্ন কর। সাধিলেই সিদ্ধি, মানবশক্তিই শক্তির চরমোৎকর্ষ, চেষ্টা করিলে হয় না এমন কার্য্যই নাই।

বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক লোক জমিয়াছিল, সকলেই বক্তার বাগ্‌বিতণ্ডায় মুগ্ধ হইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে সজোরে করতালি প্রদান করিতেছিলেন। যখন বৈজ্ঞানিক শেষোক্ত বাক্যগুলি বলিলেন, তখন ঐ জনতার মধ্য হইতে এক জন বলিয়া উঠিল মহাশয়ে! আপনি জগতের হিতকামনায় যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন তাহা সম্পন্ন করা ত অতি সহজ, তাহার জন্য এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিতে হইবে কেন? এখনই মনে করিলে আমরা তাহা সম্পন্ন করিতে পারি। পুরুষদিগকে

বাহিরে আনিয়া আপনারা গৃহে গমন করিলেই সকল কার্য্য সাধিত হইবে। যদি বলেন স্ত্রী পুরুষের মত ও পুরুষ স্ত্রীর মত হইল কৈ, তাহার উত্তরে বলি—আপনারা অন্তঃপুরে বসিয়া আপনাদিগকে পুরুষ ও পুরুষেরা বাহিরে আসিয়া আপনাদিগকে স্ত্রী ভাবিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। বিনা পরিশ্রমে কেবল মাত্র মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে। জগতের মঙ্গলের জন্য যদি এই টুকু ভাবিতে না পারিলেন তবে অসাধ্যসাধনের কষ্ট ও পরিশ্রম কি প্রকারে করিবেন? এই কথা শুনিয়া বক্তা ও শ্রোতাগণের মনে কি একটা ধাক্কা লাগিল। সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থকিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, আমিও তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

সন্ধ্যা হইলে বীডন উদ্যান হইতে বহির্গত হইলাম। চিতপুর রাস্তা ট্রামগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ও আফিসের লোকে পরিপূর্ণ। পূর্ব্ব কালের ন্যায় এক্ষণে আর ৫টায় আফিস বন্ধ হয় না। সাধারণ নিয়ম ৭টা, কিন্তু অনেকের ৮টা ৯টাও হয়। রমণীগণ কাজ সারিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া এরূপ হইয়াছে। এক্ষণে প্রায় ৯টা বাজে, আফিস সমস্ত বন্ধ হইয়াছে, তাই চিতপুর রাস্তায় এত ভিড়, সকলেই ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। বেশ্যাগণও সময় বুঝিয়া সাজিয়া বসিয়াছে। তাহাদের সজ্জা দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। একরূপ সুবর্ণ ও মুক্তার মালা প্রস্তুত করিয়া তাহারা মস্তকের কেশ, গোঁপ ও দাড়ির অগ্রে ঝুলাইয়া দিয়াছে, সমগ্র বদনমণ্ডল ও হস্ত পদাদিতে বর্ণচূর্ণ মাখিয়াছে, চক্ষুদ্বয় কজ্জল দ্বারা দীর্ঘ করিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে আচ্ছাদিত করিয়াছে। উহাদের পরিচ্ছদ ও হাবভাবাদির বিষয়

আর আমি বনর্ণা করিতে পারি না—আর লেখনী কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না; যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম সে সকল প্রকাশ করাই যাইতে পারে না, সকল কথা স্মরণও হয় না। প্রায় সমস্ত যুবতীই সুরাপানে মত্ত হইয়া বিবিধ প্রকার অকার্য্য করিতেছে, অনেক বৃদ্ধাও সেই সঙ্গে উন্মত্তা। অতি বৃদ্ধাগণও বেশ্যালয়ে গমন করিয়া জঘন্য ব্যবহার করিতেছে। পূর্ণগর্ভা যুবতীও প্রিয় বেশ্যের মনস্তুষ্টির জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুরাপানে মত্ত হইয়াছে।*

দেখিলাম অতি সমারোহে একটী বিবাহ যাইতেছে, আলোকমালায় রাস্তা পরিপূর্ণ হইয়াছে, বাদ্যশব্দে কর্ণকুহর বধির হইতেছে, বরযাত্রিনীগণ নানাপ্রকার আমোদ করিতে করিতে উর্দ্ধনেত্রে চলিয়া যাইতেছে, সর্ব্বশেষে চারি ঘোড়ার গাড়ির উপর এক ষোড়শী যুবতী বর বেশে সজ্জিতা। বিবাহ দেখিবার জন্য আমিও তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। বিবাহ-বাড়ি প্রবেশ করিয়া পুরুষাচার, বিবাহ, বাসরঘর সমস্তই দেখিলাম। ছেলেটীর বয়স আট বৎসর মাত্র, বাসর ঘরে যাইয়াই সে নিদ্রিত হইল। যুবতী অন্তঃপুরবাসী যুবক পুরুষদিগের সহিত নানারঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন। স্ত্রীগণ বিবাহ করিয়া সামাজিক কলঙ্কের দায় হইতে অব্যাহতি পায়। পতির বয়ঃপ্রাপ্তি না হইতেই রমণীগণের তিন চারিটী সন্তান জন্মে। সকলে বুঝিলেও সে সকল সন্তানকে পতির ঔরসজাত বলিয়া গণ্য করে।

রজনীযোগে আমি অনেক গৃহস্থার শয়নগৃহে যুবক যুবতী গণের কথোপকথন শুনিলাম। কোন স্থানে দেখিলাম বিংশবর্ষীয়া যুবতীর দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পতি; বালক

যুবতীর সহিত ভালরূপ আলাপ করিতেছে না বলিয়া যুবতী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাল্য বিবাহ প্রথার নিন্দা করিতেছে। কোন স্থানে দেখিলাম পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্কা যুবতীর অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক যুবক পতি। সে যুবক বৃদ্ধাকে নাকে কানে দড়ি দিয়া টানিতেছে। বৃদ্ধা গেলাম গেলাম শব্দে চীৎকার করিতেছে। কোন স্থানে দেখিলাম যুবক ও যুবতী উভয়েই যোগ্য বটে, কিন্তু তথায় যুবক ইচ্ছামত বস্ত্রালঙ্কার পায় নাই বলিয়া পত্নীর সহিত আলাপ করিতেছে না। সমাজে যদি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কখনই এরূপ কষ্ট পাইতে হইত না ইত্যাদি বলিয়া তাহারা সমাজের নিন্দা করিতেছে। কোন যুবতী আপনার দুঃখ কাহিনী বনর্ণা করিয়া পতির দয়া আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার সে আসা বৃথা হইল, পতি তাহার ভেনভেনানি শুনিয়া কহিল যদি পরিবারকে খাওয়া পরা দিতে ও সুখেসচ্ছন্দে রাখিতে পারিবে না তবে বিবাহ করিয়াছ কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকারে নানা স্থানে নানা প্রকার শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টি করিলাম, কোথাও কাহাকে সুখী দেখিলাম না।

হঠাৎ দূর হইতে আগত একটী যুবকের চীৎকার শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। "আমার সতত্ব নষ্ট করিও না, আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিও না," এই শব্দ শুনিতে পাইলাম। ঐ চীৎকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম দুই তিনটী যুবতী একটী যুবকের প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছে, যুবকটী দুর্ব্বল ও একাকী বিধায় তাহাদিগকে পারিয়া উঠিতেছে না, পরিশেষে রমণীগণ তাহাকে পরাস্ত করিল, তখন আপনার সতত্ব নষ্ট হই-

বার ভয়ে যুবক চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দেখিয়া বড় হাসির উদয় হইল। এইরূপে মানবের সকল অবস্থাই ক্রমে ক্রমে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। দেখিলাম পূর্ব্বকালে পাশ্চাত্য যুবক সমাজে যে বৈষম্য জন্য পুরুষগণ নিন্দিত হইত এক্ষণে স্ত্রী সমাজে সেই বৈষম্য সম্পূর্ণ ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। অধিকন্তু এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অনিষ্ট ও অনেক পাপ সংঘটিত হইতেছে। সাধারণতঃ অধিক বয়স্কা নারীর সহিত অল্প বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হইতেছে। সচরাচর চৌদ্দ পোনের বৎসরের স্ত্রীর সহিত আট দশ বৎসরের বালকের বিবাহ হয়। বিবাহ যে কি ব্যাপার পুরুষে তাহা আদৌ বুঝিতে পারে না, চৌদ্দ পোনের বৎসরের স্ত্রীকে তাহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দেখে, তাই তাহারা স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে। যত দিন স্বামীর বয়ঃপ্রাপ্তি না হয় তত দিন প্রায়ই স্ত্রীগণ বেশ্যা বাটীতে যাইয়া আপনাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। অনেক স্ত্রীরই স্বামীর পুরুষত্ব লাভের পূর্ব্বে সন্তান জন্মে; এই জন্য পুরুষদের সন্তানের প্রতি আদৌ মমতা জন্মে না। দেখিলাম পৃথিবীর কোন দেশেই পুরুষজাতির সন্তানস্নেহ নাই। উহা পুরুষগণের কার্য্যশূন্যতার আরও কারণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কেবল চারিটি রাঁধা বাড়া ও গৃহকার্য্য করে মাত্র, আর কোন চিন্তা বা কার্য্য তাহাদের নাই। সকল প্রকার কার্য্যভারই স্ত্রীর প্রতি অর্পিত। উপার্জ্জন, ব্যয় ও সন্তান পালন প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীরা করে। পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। কেন না তাঁহাদের পতিপ্রেম ও সন্তানস্নেহ থাকায় তাঁহারা অন্তরের সহিত স্বামীর ও সংসারের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন। পুরুষগণের সে বন্ধন না থাকায় তাহারা এক প্রকার সন্ন্যাসী বিশেষ হই-

য়াছে। স্ত্রীজাতি সংসারের সকল কার্য্য করিয়া এমনই দুর্ব্বলা ও মলিনা হইয়াছে যে, দেখিলে তাহাদিগকে প্রেতিনী ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাহাদের শরীরে লাবণ্য মাত্র নাই। অল্প বয়সে ইন্দ্রিয়গণ পরিস্ফুট হয়, সেই জন্য তাহাদিগের অল্প বয়সের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করা আবশ্যক হয়, সুতরাং দুই বৎসর বয়স হইতে তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া নিয়ত পরিশ্রমের সহিত বিদ্যা শিখিতে হয়। রাত্রি জাগরণ ও পরিশ্রমে অনেক স্ত্রীর অকাল মৃত্যু ঘটে, যাহারা বাঁচিয়া উঠে তাহারা নিতান্ত শীর্ণা ও চক্ষুহীনা হয়। প্রায় সকল স্ত্রীরই গাত্রে ফ্লানেলের জামা ও চক্ষে চসমা দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডস্থল গরম থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে ভাবিয়া প্রায় সকলেই মস্তকের কেশগুলি গলদেশে বদ্ধ করিয়া রাখে। প্রথম বয়সের ত এই অবস্থা। তাহার পরেই সংসারের সমস্ত ভাবনা, গর্ভযন্ত্রণা, সন্তানপালন প্রভৃতি সমূহ দুঃখভার এক কালে স্কন্ধে পতিত হওয়ায়, স্ত্রীজাতির কষ্টের সীমা থাকে না। যে রমণী পূর্ব্বে নিতান্ত গৌরবর্ণা ছিল এক্ষণে সে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণা হইয়াছে। দুই একটী সন্তান জন্মের পর স্ত্রীজাতির এমন আকৃতি হয় যে, তাহাকে দেখিলে মানবী বলিয়া কিছুতেই চেনা যায় না। কিন্তু পুরুষগণ দেখিতে তাদৃশ সুন্দর হয় নাই। তাহারা নিষ্কর্ম্মে ছায়ায় বসিয়া থাকিতে পাওয়াতে তাহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত কোমল ও খর্ব্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু যে পুরুষত্ব পুরুষের শোভার কারণ, তাহার অভাবে তাহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্যের লোপ হইয়াছে। শক্তিসম্পন্ন বন্য জীব বদ্ধ থাকিলে যাদৃশ অবস্থাপন্ন হয় পুরুষগণ ঠিক সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। সকল সময়েই তাহারা ম্রিয়মাণ থাকায় স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও তেজের অভাবে

এবং কার্য্যের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না থাকাতে তাহারা নিভান্ত জড় ভাবাপন্ন হইয়াছে। তাহাদের বদনমণ্ডল যেন ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রকৃতিবিরুদ্ধাচরণ মঙ্গলদায়ক নহে। বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইলেও অধীনতা পুরুষগণের নিগড় বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বকালে যখন স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন ছিল, তখন স্ত্রীদিগকে ম্রিয়মাণ দেখা যাইত না, সকল রমণীই সহাস্য আস্যে অধীনতার সুখ সম্ভোগ করিত, পতি পুত্র প্রভৃতিকে ভক্তি ও স্নেহ সহকারে সেবা ও পালন করিয়া তাহারা সুখ বোধ করিত। কিন্তু এক্ষণকার অধীন পুরুষদের সে ভাব নাই। পুত্রস্নেহ ত তাহাদের মনে কিঞ্চিৎ মাত্রই নাই, পত্নীপ্রেমও যে কিছু আছে তাহাও বোধ হয় না; সুতরাং তাহারা কোন্ সুখে সুখী হইবে? কোন্ বন্ধন তাহাদিগকে বদ্ধ রাখিবে? বস্তুতঃ এই সকল কারণে পুরুষগণের মধ্যে মানবীয় কোনও গুণই লক্ষিত হয় না। না তাৎকালিক স্ত্রীজনোচিত লজ্জা, তিতিক্ষা, দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি দৈবী গুণ না পুরুষজনোচিত বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি মানবীয় গুণরাশি ইহার কিছুই পুরুষে লক্ষিত হয় না। উহাদিগকে জড়পিণ্ডবৎ বলিলেও দোষ হয় না। স্ত্রী জাতিকে দেখিলে বোধ হয় যেন জগতের সমস্ত দুর্ভাগ্যের পরিণাম বিশেষ স্ত্রী জাতিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদিকে দেখিলে এত দুঃখ উপস্থিত হয় যে, করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতি আস্থা থাকে না। মনে হয় এই মুহূর্ত্তেই মানবজাতির বিনাশ হইলে ভাল হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতি মুক্তিলাভ করে, পুরুষও দুঃখহীন হয়। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও স্ত্রীজাতির বিশ্রাম নাই। পূর্ব্ব কালে শারীরিক বলশালী পুরুষের ও আস্ত-

রিক বলশালিনী স্ত্রীর প্রতি যে সকল কার্য্যের ভার ছিল এক্ষণে তৎসমস্তই প্রায় একাকিনী অবলা রমণীকে সম্পন্ন করিতে হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমে রমণী জর্জ্জরিতা হইয়াছে।

কেবল মানবের কষ্ট বৃদ্ধি হয় নাই, মানবের মানবত্বই নাই। মানবের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় সমস্ত গুণাবলী, সমস্ত বিদ্যা ও কৃষি, শিল্প,বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তেরই অবনতি হইয়াছে। সতীত্ব বা সতত্ব, পাতিব্রত্য বা পাত্নীব্রত্য, পিতৃ-মাতৃভক্তি, পুত্রস্নেহ, সৌভ্রাত্র বা সৌভাগিনেয়, দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, লজ্জা, তেজ, বীরত্ব প্রভৃতি মহান্ ভাব সকল আর মানবে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি রাশি রাশি পুস্তক কেবল কীটের উদরস্থ হইতেছে, কাহারও এমন অবসর নাই যে যত্নে সে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করে, পড়িবার ত সময়ই নাই! সে কালের সে ঢাকাই কাপড়, কাশ্মীরী সাল, কটকের রৌপ্যালঙ্কার, দিল্লির হস্তীদন্ত ও সুবর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্য, কৃষ্ণনগরের পুত্তলিকা, প্রভৃতি আর কোথাও নাই। বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান আর দেখা যায় না, যে ভারতীয় হল নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে সকলের নিকট হেয়রূপে গণ্য ছিল রমণীগণ তাহাও ব্যবহার করিতে পারে না, তাহারা আরও ক্ষুদ্র লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং পৃথিবী আর শস্য প্রদান করে না। আমি একটী জনসংখ্যার তালিকা পাঠ করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীতে পূর্ব্বের অর্দ্ধেক মানবেরও অস্তিত্ব নাই। রমণীগণ মানবের এই হীনতা নিবারণ করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে, কত সভা সমিতি, কত প্রবন্ধ

পাঠ করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না।

একদিন আমি দেখিলাম মহানগরীর টাউন হলে মহতী সভা হইয়াছে। তথায় এত লোকের সমাগম হইয়াছে যে, দাঁড়াইবারও স্থান হইতেছে না। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমি তথায় প্রবেশ করিলাম। সভার মন্তব্য শুনিয়া বুঝিলাম মানবের দুঃখ নিবারণ ও সুখবর্দ্ধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই এই সভার অধিবেশন হইয়াছে। অনেক কৃতবিদ্যা রমণী নানা প্রকার বক্তৃতা করিলেন শুনিলাম। কি জন্য মানব এত কষ্ট পায় তাহার কারণানুসন্ধান করা ও যাহাতে তাহা নিবারিত হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করাই সকল বক্তৃতার মুখ্য উদ্দেশ্য। একজন কহিলেন "বাল্য বিবাহই সকল অনিষ্টের মূল কারণ। যুবতীগণ ১৪।১৫ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যেই বিবাহ করেন ও অতি অল্প বয়সেই সন্তান প্রসব করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। অতি অল্প বয়সেই সংসারের যাবতীয় ভার, সন্তান সন্ততি স্কন্ধে পতিত হয়, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়েন। সন্তানও ভয়ানক দুর্ব্বল হয়, যে পুরুষের ঔরসে ঐ সন্তান জন্মে তাহাদের বয়ঃক্রম আরও অল্প, এমন কি তখন তাহাদের সন্তান জন্মিবার শক্তিই জন্মে না। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বয়ঃক্রম অল্প না হইলে পুরুষ বশ্যতা স্বীকার করে না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া যুবতী রমণীর সহিত বালকের বিবাহ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। বিংশবর্ষীয়া রমণীর সহিত ষোড়শ বৎসরের পুরুষের বিবাহ দিলেও ত ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কিন্তু তাহাতে একটু ধৈর্য্যের আবশ্যক, সে ধৈর্য্য কাহারও নাই, রমণীগণ যৌবনের উন্মেষ হইতেই—১৩।১৪ বৎসর বয়স হইতেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ

হয়েন। তাঁহারা বালক বিবাহ করিয়া যথেচ্ছাচারিতার পথ খুলিয়া দেন। ঐ কারণ হইতেই মানব জাতি ধর্ম্মহীনা দুর্ব্বলা, দরিদ্রা ও রুগ্না হইতেছে। অতএব যাহাতে বাল্য বিবাহ বন্ধ হয় অর্থাৎ স্ত্রীর ২০ হইতে ৩০ ও পুরুষের ১৬ হইতে ২৫ বৎসর বয়স বিবাহ কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক।” একজন উহার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন “রমণীগণের অধিক বয়সে বিবাহ হইলে অনেক দোষের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ অধিক বয়সে প্রথম গর্ব্ভ হইলে প্রায়ই সন্তান সহ গর্ভিনীর প্রাণ নাশের সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ নিয়ত ভ্রূণহত্যা হইয়া লোক সংখ্যার হ্রাস ও পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণা হইবে। কেন না রিপু দমন করিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ১৩।১৪ বৎসরেই স্ত্রীজাতির সন্তান উৎপাদনের শক্তি জন্মে। কয় জন লোক স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিকূলাচারণ করিতে সমর্থ হইবে? অধিকাংশ লোকই গোপনে ভ্রূণহত্যা করিয়া শরীর নষ্ট করিবে সুতরাং পাপের ও অনিষ্টের বৃদ্ধি বই কম হইবে না।”

একজন কহিলেন “পুরুষস্বাধীনতা না থাকাই সকল দুঃখের কারণ। ঈশ্বর সকলকেই স্বাধীন করিয়াছেন, আমাদের অধিকার কি যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখি। এই অস্বাভাবিক অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠানই আমাদের সকল অমঙ্গলের নিদান। বিশেষতঃ পুরুষজাতি সমগ্র মানবের অর্দ্ধ পরিমাণ; যদি অর্দ্ধ পরিমাণ মানব নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিল, কোন প্রকার উন্নতি না করিল, তবে পৃথিবীর দুঃখ হইবে না কেন? তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিলে অবশ্য আমাদের দুঃখ ঘুচিবে।” এক জন তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন “ও কারণ প্রকৃত নয়, কেন না পূর্ব্বে পুরুষগণত স্বাধীন ছিল, তবে তখন জগতের দুঃখ

ঘুচে নাই কেন? একজন কহিলেন "তাহার কারণ আছে, তখন পুরুষগণ স্বাধীন ছিল বটে, কিন্তু স্ত্রীগণ অধীন ছিল। সুতরাং অর্দ্ধ পরিমিত লোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিত। তাহা করিলে চলিবে না, এমন নিয়ম করিতে হইবে যেন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে, কেহ কাহারও কার্য্যের বাধা দিতে না পারে।" আর এক জন কহিলেন "পুরুষকে স্বাধীনতা দিলে তাহা হইবে না। কেন না তাহারা স্ত্রীজাতি অপেক্ষা বলবান না হইলেও তাহাদের অনেক সুবিধা আছে; স্ত্রীজাতিকে গর্ব্ভধারণাদি কার্য্য জন্য অনেক সময় অসহায়া হইয়া থাকিতে হয়। পুরুষ স্বাধীন হইলে সেই সেই অবসরে স্ত্রীজাতিকে অধীন করিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ স্ত্রী-জাতির অল্প বয়সে সন্তান জান্মিবার শক্তি জন্মে সুতরাং অধিক বয়স্ক পুরুষ তাহাদের পতি হইবে। অধিক বয়স্কগণ স্বাভাবতঃই অল্প বয়স্কদিগের উপর প্রভুতা করিয়া থাকে, কাযে কাযেই ক্রমে স্ত্রীগণ পুরুষের অধীন হইয়া পড়িবে। অতএব পুরুষ-স্বাধীনতা মঙ্গলজনক নহে। আসল কথা এই যে, পুরুষগণ সন্তানের জন্ম প্রদান ও প্রতিপালনাদি করে না, সেই জন্যই জগতের কষ্ট। আমরা যদি কেবল বাহিরের কার্য্য করি আর পুরুষেরা সমস্ত গৃহ-কার্য্য ও গর্ব্ভধারণাদি সন্তানের সমস্ত কার্য্য করে, তাহা হইলে কোন কষ্টই থাকে না। সকল দিকেই মঙ্গল হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই আমাদের একান্ত আবশ্যক। তাহা না করিয়া পুরুষের স্বাধীনতা দিলে তাহারা পূর্ব্ববৎ আমদিগকে এককালে অধীন করিবে। তাহা হইলে পূর্ব্বকালে যেরূপ ছিল পুনরায় তাহাই হইবে, আমাদের সমুদায় চেষ্টা বিফল হইবে।

অধীনতা জনিত দুঃখে আমরা ম্রিয়মাণ হইব, সুতরাং তাহাতে জগতের প্রকৃত মঙ্গল হইবেনা. অধিকন্তু আমরা যে বাস্তবিক শক্তিহীনা তাহাই প্রতিপন্ন হইবে, সুতরাং পুরুষেরা আমাদিগকে আরও অধীন করিবে। অতএব পুরুষস্বাধীনতা কিছুতেই মঙ্গল-জনক নহে।” এই রূপ নানা জনে নানা প্রকার বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত উপায় কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সভাপত্নী মীমাংসা করিলেন; তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে “এমন কোন উপায় করা আবশ্যক যাহাতে কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহাকেও কাহারও অধীন হইতে না হয়, সকলেই স্বাধীন থাকিয়া শক্তি ও প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিয়া পরস্পরের উপকার করে। তদ্রূপ পন্থা আবিষ্কৃত হইলে মানবের দুঃখ ঘুচিবে ও জগতের প্রকৃত উন্নতি হইবে। সকলেরই সাধ্যানুসারে সেই পন্থার অন্বেষণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। সে উপায় যে কি তিনি তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন না।

সভা ভঙ্গ হইলে সকলেই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। সেই ভিড়ের মধ্যে আমি একটী যুবতীকে দেখিলাম; আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল যেন আমি তাহাকে চিনি, কিন্তু সে যে কে তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। পরিশেষে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সেই গৃহে, যেখানে স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত হইয়াছিল, যে গৃহে প্রথমে স্ত্রী পুরুষের কার্য্য করিতে ও পুরুষ স্ত্রীর কার্য্য করিতে সম্মত হইয়া পুরুষ অন্তঃপুরে ও স্ত্রী বাহিরে আসিয়াছিল সেই বাটীতে প্রবেশ করিল। তখন আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। কিন্তু তাহার সে ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি আর নাই। সুবর্ণকান্তির পরিবর্ত্তে মসীকান্তি

হইয়াছে, দেবাকৃতির পরিবর্ত্তে প্রেতাকৃতি হইয়াছে। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "জীবিতেশ্বর! বুঝিবার দোষে অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া আমরা ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছি।" তথাবিধ অবল অধীন স্বামী গুরুতুল্যা পত্নীর মুখে ঈদৃশ সম্মানসূচক বাক্য শুনিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া কহিল "নাথে! আপনি আমাকে বিদ্রুপ করিতেছেন কেন? আপনার কি বুঝিবার দোষ হইয়াছে?" রমণী কহিল "বিদ্রুপ নয়, পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। যে দিন আমি বলিয়া ছিলাম পুরুষ বড় অত্যাচারী, তাহারা স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া বড় কষ্ট দেয়, সেই দিন অনেক তর্ক বিতর্কের পর আপনি আমাকে স্বাধীন হইতে বলিয়া আপনি অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেটী বড় অন্যায় হইয়াছে। কেন না আমরাই স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিলাম, পুরুষদিগকে অধীন করিতে ত চাহি নাই! কিন্তু আপনি বিপরীত ব্যবস্থা করিয়া জগতের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। দেখুন দেখি দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছে! পূর্ব্বকালে যে সকল মানবীয় অক্ষয় কীর্ত্তি সকল ছিল, তৎ-সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, সমস্ত মানবই জীর্ণ শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়াছে! আর কিছু দিন এরূপে চলিলে এক কালে মানব জাতির লোপ হইবে। যদি আপনারা এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা না করিতেন তাহা হইলে কখনই এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইত না।"

যুবকের যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। পূর্ব্ব কথা সকল স্মরণ হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া সহাস্যে কহিলেন, "প্রেয়সি!

এ তোমার কি রূপ অন্যায় দোষারোপ! আমি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সহিত পদপরিবর্ত্তন করিয়া ছিলাম? তোমরা আমাদের স্বাধীনতা দেখিয়া হিংসায় যে ফাটিয়া মরিতে? তুমি সে দিন আমার সহিত যেরূপ বিতণ্ডা করিয়াছিলে তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? বার বার বুঝাইলাম, পুরুষ বাস্তবিক স্বাধীন নহে, তাহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীজাতির দাস; তাহারা নিয়ত পরিশ্রম করিয়া কেবল স্ত্রীজাতিরই সেবা করে। স্ত্রীজাতি বাস্তবিক পরাধীন নহে তাহাদের শক্তি অল্প, তাই পুরুষের প্রেমপূর্ণ আশ্রয়ে থাকিয়া শক্তির অনুরূপ কার্য্য করে। বার বার ইহা বুঝাইয়া দিলেও যখন তুমি বুঝিলে না তখন কাযেই আমাদের পদ তোমাদিকে ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম এরূপ অবস্থায় বলপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এক বার পুরুষের সুখ সম্পত্তি ভোগ করিলে বুঝিতে পারিবে পুরুষ কত সুখী। এখন সে দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপান হইতেছে কেন?"

রমণী কহিলেন, "অবশ্য আমাদের প্রার্থনা অনুসারেই আমাদিগকে স্বাধীন করিরাছেন, কিন্তু আমরা ত আপনাদিগকে অধীন করিতে চাহি নাই। আমরা আপনাদিগের অধীনতারূপ নিগড় ছেদন করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম মাত্র। যদি কেবল তাহাই করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই সুমঙ্গল হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া আপনারা আমাদের অধীন হইলেন। যে জাতি চীরদাসী সে এক দিনে প্রভুর প্রভু হইল। এত পরিবর্ত্তন সহিবে কেন? কিরূপে চিরপরাধীনতাজন্যঅবলা নারী চিরস্বাধীন বলবান পুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া পারিয়া উঠিবে?"

যুবক।—"এ কথা অতি অন্যায় বলিতেছ, আমরা ত তোমাদের সহিত দ্বন্দ্ব করি নাই, মাথা হেট করিয়া তোমাদের অধীনতা

স্বীকার করিয়াছি। যদি আমরা তোমাদের সহিত দ্বন্দ্ব করিতাম তাহা হইলে তোমাদের অক্ষমতার যে হেতু প্রদর্শন করিলে তাহা ঠিক বলিয়া মানিতাম। যদি প্রবল ব্যক্তি আদৌ বল প্রকাশ না করে তবে দুর্ব্বল ব্যক্তি কেন প্রবলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিবে না? এরূপ অবস্থায় কার্য্য করিতে না পারিলে শক্তিহীনতারই পরিচয় দেওয়া হয়। বাস্তবিক তোমাদের পুরুষের তুল্য শক্তি নাই, সেই জন্য তোমরা পুরুষের কার্য্য করিতে পার নাই। উহা প্রত্যক্ষতঃ সপ্রমাণ করিবার জন্যই আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তোমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলাম।"

যুবতী।—"ও কথা কোন কার্য্যেরই নহে। পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই সমান শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বহুকাল অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় আমাদের শক্তির খর্ব্বতা হইয়াছে। স্বাধীন হইলে ক্রমে আমরা সবলা হইতে পারিতাম, কিন্তু একবারে ভয়ানক ভার স্কন্ধে পতিত হওয়াতেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।"

যুবক।—"তুমি কহিলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই তুল্যশক্তিসম্পন্ন, কেবল অভ্যাসদোষে স্ত্রী দুর্ব্বলা। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আদিম কালে সকল দেশেরই স্ত্রী অধীনতা স্বীকার করিল কেন? কোনও দেশে কোনও কালে পুরুষেরা স্ত্রীর অধীন হইল না কেন? প্রথম অবস্থায় ত অভ্যাসদোষ জন্মিতে পারেনা।"

যুবতী।—"তাহার কারণ বোধ হয় পুরুষের অন্যায়াচরণ করিবার প্রবৃত্তি অধিক ও স্ত্রীর শান্তিসংস্থাপনোপযোগী বৃত্তি বলবতী"

যুবক।—"যদি শক্তি অধিক না থাকে তাহা হইলে কি কেবল ইচ্ছাবলে পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে পারা যায়?

কখনই না, অবশ্যই বলিতে হইবে পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা স্বভাবতঃ বলবান। বলবান দুর্ব্বল বুঝিবার উহাই এক মাত্র উপায়। এ সকল কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি।"

যুবতী।—"স্বীকার করিলাম পুরুষ অপেক্ষাকৃত বলবান ও স্ত্রী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলা। কিন্তু তাই বলিয়া কি স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করা পুরুষের উচিত? তবে আর বিধি ও শাস্ত্র সকলের প্রয়োজন কি? মানব ও পশুতে প্রভেদ কি? যাহার যেরূপ শক্তি আছে সে তদনুরূপ কার্য্য করুক, তাহাতে সমাজের মঙ্গল হউক বা দেশ উৎসন্ন যাউক তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই! ইহাই কি মানবত্ব?"

যুবক।—"স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কার্য্য করা যে আদৌ উচিত নয় এ কথা আমি বলিতে পারি না। যাহার যেরূপ শক্তি তাহার তাহা প্রকাশ করা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, তবে ঈশ্বর তাহাকে সেরূপ শক্তি দিয়াছেন কেন? কিন্তু তাহাও আমি বলিতেছিনা, কেননা পুরুষকে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতে হইবে এমত কথা ত আমি কখনই বলি নাই, আমি বরাবরই বলিতেছি পুরুষ স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে না, রক্ষা করে ও উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করে মাত্র।"

যুবতী।—"তবে আমাদিগের স্বাধীনতা নাই কেন?"

যুবক।—"তোমাদের যে স্বাধীনতা আছে তাহা আমি বারবার বুঝাইয়াছি, ভ্রান্ত-বুদ্ধি বশতঃ তোমরা তাহা বুঝিতেছ না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ তোমরা বুঝ না, সেই জন্যই তোমাদের ইচ্ছামত স্বাধীনতা দিবার জন্য আমরা অন্তঃপুরবাসী হইয়াছিলাম। কৈ তোমরা ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিলে না!"

যুবতী।—"ওরূপ স্বাধীনতা যে অস্বাভাবিক। যেরূপ

স্বাধীনতায় আর এক জনকে অধীন হইতে হয়, তাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলে না, উহা অধীনতা অপেক্ষাও ভয়ানক; কেন না তাহাতে অধীনদিগের সমস্ত ভারই স্বাধীনদিগের স্কন্ধে স্থাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের যেমন আমাদিগকে অধীন করা অন্যায় সেইরূপ আমাদেরও তোমাদিগকে অধীন করা অন্যায়। উভয়েরই পরস্পর স্বাধীন থাকা উচিত।”

যুবক।—তবে তোমার মতে কি স্ত্রী-পুরুষমিশ্রণ কল্যাণকর? স্ত্রী পুরুষ কি নিয়ত একত্রিত থাকিবে, ও পরস্পর সমান কার্য্য করিবে? কিন্তু তাহা যেমন অসম্ভব তেমনি অকল্যাণকর। স্ত্রী পুরুষের সহিত সমান কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া স্ত্রী যাহা পারে তাহা স্ত্রী করে এবং পুরুষ যাহা পারে তাহা পুরুষে করে; এবং স্ত্রী পুরুষ একত্রিত থাকিলে সমূহ অনিষ্ট হয় এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করে। স্ত্রী অল্প কার্য্য করে বলিয়া পুরুষের নিকট বাধ্য থাকে ও রক্ষিত হইবার শক্তি অল্প বলিয়া সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করে। উহা বাস্তবিক অধীনতা নহে, যদি ঐরূপ অধীনতা স্বীকার করিতে না চাও তবে পুরুষের সহিত সমান কার্য্য কর ও ইন্দ্রিয় দমনে তৎপর হও। কিন্তু তাহা কি পারিবে?

যুবতী।—“কেন পারিব না? তোমরাও মানব আমরাও মানব এবং তোমরাও ঈশ্বরের সৃষ্ট আমরাও ঈশ্বরের সৃষ্ট।”

যুবক।—ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ কি সমান শক্তি সম্পন্ন? না ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই পরস্পর সমান? দুইটী সমান পদার্থ কি সমগ্র পৃথিবীর কোনও স্থানে দেখিয়াছ? অবশ্যই না। তবে “ঈশ্বরের সৃষ্ট কেবল এই সত্য বলে স্ত্রী ও পুরুষ সমান এ কথা বলার অধিকার কৈ? যাহা হউক তোমরা যুক্তি মানিবে না।

"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।" পুরুষের পদ তোমাদের উপযোগী নয় তাহা যেমন আগে বুঝ নাই, এক্ষণে বুঝিয়াছ, ঐরূপ আবার যখন ঠেকিয়া শিখিবে তখন আবার বুঝিবে যে, পুরুষের সহায়তা ভিন্ন তোমাদের কার্য্য করিবার শক্তি আদৌ নাই।"

যুবতী। 'পুরুষের সহায়তা ব্যতিরেকে যে আমরা কার্য্য করিতে পারি না এ কথা আমরা স্বীকার করি। ঐ জন্যই আমরা স্বাধীনতা পাইয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমরাও কি স্ত্রীর সহায়তা ভিন্ন সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার? কখনই না।

যুবক।—"স্ত্রীর সহাহায়তা আমাদের আবশ্যক বটে। কিন্ত সে কেবল স্ত্রীরই কার্য্যের জন্য। যদি পুরুষদিগকে স্ত্রীর সহায়তা করিতে না হইত, তাহা হইলে তাহাদের আদৌ স্ত্রীর সাহায্য আবশ্যক হইত না। পুরুষ আপন কার্য্য আপনিই সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্ত স্ত্রী তাহা পারে না। কেন না সন্তান স্ত্রীর অঙ্গেই উৎপন্ন হয়। যদি ইতর-প্রাণীর ন্যায় পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর স্বাধীন থাকে, তাহা হইলে সন্তান প্রতিপালনাদি সমস্ত কার্য্য কেবল স্ত্রীর স্কন্ধেই পড়ে। স্ত্রী একাকিনী কি তাহা সম্পন্ন করিতে পারে? কখনই না। পুরুষের সে ভাবনা নাই— পুরুষ সন্তান উৎপাদন করিয়া দিয়াই প্রস্থান করিতে পারে। সুতরাং সন্তানদের ভার তাহাকে আদৌ লইতে হয় না। আপন উদর পূরণ করিতে পারিলেই তাহার হইল। যাহা হউক আর তর্কের আবশ্যকতা নাই। অদ্যাবধি উভয়ে সমান সমান রূপ কার্য্য করিব। কেহ কাহারও অধীন হইব না। সমস্ত পরিশ্রম সমস্ত ব্যয়ভার উভয়কে সমান সমান বহন করিতে হইবে।"

এই বলিয়া যুবক যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া বহির্বাটীতে আগমন করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আজি পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার দেখিলাম; দৃশ্য নূতন, ভাব নূতন, কার্য্যপ্রণালী নূতন, সকলই নূতন। স্ত্রী পুরুষ আজি সম্পূর্ণ সমভাবে কার্য্য করিতেছে। রাস্তা, ঘাট, মাঠ, বাজার সর্ব্বত্রই স্ত্রী পুরুষে পরিপূর্ণ। গৃহ সমস্ত দিবাভাগে প্রায়ই মানব-শূন্য থাকে। সে সময়ে আফিস, বাজার, রাস্তা, মাঠ, প্রভৃতি স্থান লোকে পরিপূর্ণ। গৃহের আকৃতিও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে. কোন গৃহেরই আর খণ্ডান্তর নাই—অন্তঃপুর না থাকায় দ্বিতীয় খণ্ডের কোন প্রয়োজনই নাই, সমস্ত গৃহই বহি-বাটী—সমস্ত গৃহই অন্তঃপুর। রাত্রিকালে সমস্ত গৃহই মানবে পরিপূর্ণ থাকে, দিবাভাগে স্ত্রী পুরুষ সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে গমন করে, গৃহ প্রায় শূন্য থাকে। যাহাদের দাস দাসী আছে, তাহাদের গৃহে দাস দাসী থাকে, যাহাদের তাহা নাই তাহাদের গৃহ চাবি-বদ্ধ থাকে। অতি প্রত্যূষে রাস্তার দিকে দৃষ্টি পড়িল দেখি-লাম রাস্তা সুন্দর বেশেসজ্জিত স্ত্রী পুরুষে পরিপূর্ণ। সকলে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী সকলেই এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন। পরস্পর বন্ধু বান্ধবের সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন, আনন্দের সীমা নাই; পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক গণের আজি আনন্দের তুলনা নাই। তাঁহাদের সভাসমিতি ও বক্তৃতা সফল হইয়াছে, তাঁহাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নতির সময় বর্ত্তমান, তাঁহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন। ভ্রমণ করিতে করিতে আনন্দে পত্নী,

ভগিনী, বন্ধুপত্নী প্রভৃতির কর মর্দ্দন ও মুখচুম্বনাদি করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন ও নানা প্রকারে সাম্য ভাবের পরিচয় দিতেছেন।

রৌদ্র উঠিলে সকলেই আপন আপন গৃহে গমন করিলেন; যাঁহাদের দাস দাসী আছে তাঁহাদের প্রাতঃকালের গৃহকার্য্য সকল সম্পূর্ণ হইয়াছে, যাঁহাদের তাহা নাই তাঁহারা গৃহে যাইয়া সেই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিলেন, কেহ ঝাঁট্ দিলেন, কেহ বাসন মাজিলেন, কেহ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন, এই রূপে ভোজনাদি সমাপন করিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলে কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিলেন। কেহ চাকরি স্থানে ও কেহ দোকানে গমন করিলেন। সকলেই উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন, স্ত্রী ভাবিতেছেন পুরুষ অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিবেন, পুরুষ ভাবিতেছেন স্ত্রী অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিবেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলেই নিয়ত তৎপর। দেখিয়া বোধ হইল এত দিনে জগতের প্রকৃত উন্নতি হইল। এত দিনে মানব প্রকৃত সুখী হইল, এত দিনে মানব নাম সার্থক হইল। নিতান্ত আগ্রহের সহিত সমগ্র দেখিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

নয়টা বাজিলেই গৃহী ও গৃহিণীগণ কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিলেন, পুত্রকন্যাগণ বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিখিতে গেল, যে সকল শিশু বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত হয় নাই তাহারা পিতা মাতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিল—স্তন্যপায়ী শিশু মাতার সহিত ও যাহারা স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে তাহারা পিতার সহিত গমন করিল। যাঁহাদের আয় বেসি তাঁহারা দাস ও ধাত্রী সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর সকলে আপনার নিকটেই সন্তানদিগকে রাখিলেন।

উমেদারগণ সন্তান ক্রোড়ে করিয়াই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দেশে চাকরি করেন তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য পান না। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজে বা দাস দাসী দ্বারা আপনার সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। ছুটির সময়ে তাঁহারা একত্রিত হয়েন, আর সকল সময়েই ভিন্ন হইয়া থাকেন।

সর্ব্বাগ্রে কলিকাতার অবস্থা দেখিতেপাইলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিপনী শ্রেণী শোভা পাইতেছে, স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঐ সকলের স্বত্বাধিকারী। গণনা করিয়া দেখিলাম স্ত্রী জাতিরই দোকান অধিক। বড় দোকান অতি অল্প, ক্ষুদ্র দোকানেরই সংখ্যা অধিক। বড় বড় দোকানে দাস দাসী যথেষ্ট আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র দোকানে তাহা কি প্রকারে থাকিবে? অনেক দোকানেই দুই জন করিয়া লোক রহিয়াছে, এক জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ—এক জন মুনিব এক জন চাকর। স্ত্রী মনিবেয় পুরুষ চাকর ও পুরুষ মনিবের স্ত্রী চাকরই অধিক। আবার এমন দোকানও অল্প নয় যাহাতে একজন মাত্র সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে। শিশু সন্তানের অত্যাচারে ঐ সকল দোকানদারণী দিগের ও অল্প বেতনের চাকরি বৃত্তি অবলম্বনকারিণী দিগের ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। স্ত্রীজাতি যে কালে পুরুষের পদ গ্রহণ করিয়াছিল সে সময়ে যেরূপ ক্ষতি হইত দেখিয়াছি, ঠিক সেইরূপ ক্ষতি হইতেছে। প্রভেদ এই সে সময়ে সংসারের সমস্ত ভার স্ত্রী জাতির প্রতি অর্পিত থাকায় সমস্ত ব্যয়ভার স্ত্রী জাতিরই স্কন্ধে ছিল, এক্ষণে সেরূপ নয়, এই জন্য এ ক্ষতিতে সমগ্র পরিবারের এক কালীন অনশন ঘটেনা। কিন্তু তথাপি তাহাতে অল্প অনিষ্ট হইতেছেনা। কেননা এক্ষণে

নিয়ম হইয়াছে সংসারের যাবতীয় ব্যয় স্ত্রী ও পুরুষ সমান ভাগ করিয়া দিবে। যদি কেহ সমান না দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হয়, ক্রমে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক ও বিক্রয় হয় ও পরিশেষে দাসখত লিখিয়া দিয়া ক্রীত দাসের ন্যায় সম্পূর্ণ অধীন হইতে হয়। পত্নী অক্ষম হইলে পতির ক্রীত দাসী হয়, পতি অক্ষম হইলে পত্নীর ক্রীত দাস হয়। সচরাচর উপরিউক্ত প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত রমণী গণকেই ঐরূপ দাসখত লিখিয়া দিতে হয়। দেখিলাম যে স্বাধীনতা লাভ আশয়ে মানব পারিবারিক বন্ধন ভঙ্গ করিয়া এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে এই কারণে ও অন্যান্য নানা কারণে তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইতেছে। শুধু বিফল নহে, অধীনতার মাত্রা ভয়ানক বাড়িয়াছে। মহাধনবান ইংলণ্ডে যেমন দারিদ্র অত্যন্ত অধিক, স্বাধীন মানবসমাজে সেইরূপ অধীনতাও অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। 'শক্তির জয়' এই মহামন্ত্র সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে, মানবীয় ভাব সকলের এককালে লোপ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে শক্তিমানদিগেরও প্রকৃত সুখ হয় নাই।

কেবল দরিদ্র সমাজে এ দোষ ঘটে নাই। ধনীগণের মধ্যেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছে। কেননা ধনীগণ উত্তরাধিকার ক্রমে যথেষ্ট ধন পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের স্ত্রী বা স্বামীর সেরূপ ধন পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা ধনী বা ধনিনীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়েন। পৈতৃক বিষয় এক্ষণে পুত্র ও কন্যাগণ সমভাবেই অংশ মত প্রাপ্ত হয়েন। যে দেশে জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম প্রচলিত সে দেশে কন্যাই হউক আর পুত্রই হউক যে জ্যেষ্ঠ হয় সেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। সমস্তই হউক বা অংশ মতই হউক ধনীসন্তানগণ প্রচুর বিষয়শালী

হয়েন, তাঁহাদের স্ত্রী বা পতিগণ প্রায়ই ধনীসন্তান হইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বামী বা পত্নীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকিতে হয়। বিশেষতঃ ধনীগণ আপনাদের প্রভুতা বজায় রাখিবার জন্য দরিদ্র ও অক্ষম পতি বা পত্নীই গ্রহণ করিয়া থাকেন; সমান সমান পতিপত্নীর মিলন তাঁহাদের আদৌ পছন্দ নহে। এইরূপে দরিদ্র ও ধনী সমাজে ভয়ানক বৈষম্য ও অধীনতা বিরাজিত হইয়াছে।

মধ্যবর্ত্তী দলেও অধীনতার প্রভাব অল্প নহে। কেন না ঐ দলের অধিকাংশেরই স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান আয় নহে, কাহারও স্বামীর আয় বেসি, কাহারও স্ত্রীর আয় বেসি। যাঁহার আয় অধিক তিনি উত্তম চালে চলিতে চাহেন, সুতরাং তদুপযোগী ব্যয়ের অর্দ্ধেক অন্যকে দিতে হয়, কিন্তু যাঁহার আয় অল্প তিনি তাহা দিতে পারেন না, কাযে কাযেই অধিক আয়বানের অধীন হইয়া পড়েন। কেবল যে সকল দম্পতীর উভয়েরই সমান রূপ শিক্ষা ও সমানরূপ আয় আছে তাঁহাদেরই কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। কিন্তু এরূপ লোক অতি বিরল।

আমি সদর রাস্তা দিয়া চলিলাম। দেখিলাম দোকানদার ও দোকানদারণীগণ দোকানের দ্রব্য সকল সাজাইয়া বসিয়া আছেন। খরিদদার অপেক্ষা দোকানের সংখ্যা অধিক। পূর্ব্বে কেবল পুরুষে কার্য্য করিত, এক্ষণে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছে কিন্তু কার্য্য ত আর বাড়ে নাই, যে কার্য্য ছিল তাহাই ত ভাগ করিয়া করিতে হইবে। কৃষি বল, শিল্প বল, বাণিজ্য বল, চাকরী বল সকল কার্য্যেরই সীমা আছে। যে ভূমিতে শত ব্যক্তি কৃষি কার্য্য করিত সেই ভূমিতে দুই শত ব্যক্তি কৃষি কার্য্য করিলে কাযেই প্রত্যেকের ভাগে ভূমির পরি-

মাণ কম হয়, বন জঙ্গল পতিত সমস্ত ভূমি কৃষিযোগ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক ভূমি হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি প্রত্যেকের অংশে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্প ভূমি পড়িয়াছে। অধিক শ্রম করিয়া অল্প জমিতে অধিক ফল ফলাইবার চেষ্টাও বৃথা হইল, কেন না প্রতি বৎসর সমস্ত ভূমিতে শস্য হইলে ভূমির যে উর্ব্বরতাশক্তি নষ্ট হয়, সে পরিশ্রম ভূমির সেই উর্ব্বরতা সম্পাদন কার্য্যেরই যোগ্য হয় না। অনেক শিল্পী হইয়াছে কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য বশতঃ সে সকল অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়। দোকান অনেক অধিক হইয়াছে কিন্তু বিক্রেয় দ্রব্যের পরিমাণ পূর্ব্ব পরিমিত থাকায় প্রত্যেক দোকানেই বিক্রয় অল্প হয়। চাকরির অবস্থা আরও মন্দ হইয়াছে। পালে পালে উমেদার উপস্থিত দেখিয়া, সমস্ত পদেরই বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অনেক পদের অর্দ্ধেক বেতনও নাই। ৫০৲ টাকা মুন্সেফ, ডেপুটী মেজেষ্টারের বেতন। ৫। ৭৲ টাকায় অনেকে কেরাণিগিরি করে। চাকরির সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বেতন এত অল্প হইয়াছে যে, পূর্ব্বে একা পুরুষ চাকরী করিয়া যে বেতন পাইত এক্ষণে অনেকে সপরিবারে খাটিয়া তাহা পায় না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষময় ফল ফলিয়াছে। পূর্ব্বকালে হিন্দুসমাজে প্রতিদ্বন্দিতা কেবল এক জাতিনিবদ্ধ ছিল, তখন তাদৃশ বৈষম্য ছিল না; পরে জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা হইলে প্রতিদ্বন্দিতার ক্ষেত্র বাড়িয়া পড়িল; তখন সকল লোকই দিবা নিশি পেটের দায়ে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডে ঐ কারণে দরিদ্রসমাজে দুঃখের পার ছিল না। এক্ষণে স্ত্রী পুরুষে প্রতিদ্বন্দিতা—পতিপত্নী মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা,

দুরবস্থার শেষ হইয়াছে, মনুষ্য মধ্যে মনুষ্যত্ব এক কালে নাই।

একটী খরিদ্দার আসিয়াছে দেখিয়া শত শত দোকানদার তাহাকে 'আসিতে আজ্ঞা হউক, আমার নিকট ভাল জিনিষ আছে, খুব সস্তা পাইবেন' ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতে লাগিল— হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। খরিদ্দার মহা শঙ্কটে পড়িলেন, কাহার কথা শুনেন, কোন দোকানে যান তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে যে দোকানের অতি নিকটে ছিলেন সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন। তখনও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একজন দোকানদারনী "ঐ দোকানে যাচ্চেন ভাল দোকান বাছিয়া লইয়াছেন পচা মাল আর কোথায়ও নাই" ইত্যাদি বলিতে লাগিল। পরে জানিলাম ঐ দোকানদারনী পার্শ্ববর্ত্তী দোকানদারের স্ত্রী। আপন আপন স্বার্থসাধন জন্য স্বামীস্ত্রীতেও এইরূপ নানা প্রকার বিবাদ ও পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করে। কোন মধ্যস্থ ব্যক্তি এবম্বিধ আচরণের অবৈধতার কথা বলিলে তাহারা বলে, 'যখন আমাকে সংসারের অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে হইবে তখন যাহাতে আমার লাভ হয় কেন তাহার চেষ্টা করিব না? যদি এখানে আমার দোকান না হইয়া আর এক জনের দোকান হইত তাহা হইলে সে কি চুপ করিয়া থাকিত?' চাকরী লইয়াও ঐরূপ বিবাদ। যে চাকরীর জন্য স্বামী চেষ্টা করিতেছে তাহার স্ত্রী তাহার নামে দোষারোপ করিয়া সেই কার্য্য আপনার জন্য চেষ্টা করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ ব্যাঘাতের চেষ্টা করে। কেননা যাহার আয় বাড়িবে তিনি সংসারের ব্যয় বাড়াইবেন সুতরাং তাহার অর্দ্ধেক দিতে না পারিলে অন্যকে অধীনত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই পতি পত্নী

পরস্পরের এইরূপ ভয়ানক ঈর্ষা ভাব পরিলক্ষিত হয়। স্কুল হইতেই এই ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দিতা শিক্ষা আরম্ভ হয়। বিবাহিত ছাত্র ও ছাত্রীগণ আপন আপন পত্নী বা পতি অপেক্ষা ভালরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করে।

রাস্তা বহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলাম কত রঙ্গ, কত কত ব্যাপার দেখিলাম তাহা বলিয়া উঠা যায় না। যে সকল দোকানে কেবল এক জন মাত্র লোক রহিয়াছে সেই সকল দোকানে দ্রব্য কিনিবার ছলে প্রবেশ করিয়া লোকে নানা প্রকার কৌতুক ও অশ্লীল ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। সে সকল বর্ণন করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। স্ত্রীলোকের দোকানে পুরুষ যাইতেছে, পুরুষের দোকানে স্ত্রী যাইতেছে। স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীরা এবং যাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে চাকরী করে সেই সকল যুবক যুবতীরা কোন প্রকার ছল করিয়া স্কুল ও কার্য্য স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া ঐরূপ কার্য্য করে।

কিয়দ্দূরে যাইয়া দেখিলাম একটী ষোড়শী যুবতী ও একটী বিংশবর্ষ বয়স্ক যুবক এক এক খানি পাস হস্তে লইয়া একটী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের হাব ভাব দেখিয়া মনে সন্দেহ হওয়ায় তাহাদের সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই দেখিলাম। কিয়ংক্ষণ পরে তাহারা বহির্গত হইলে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী স্কুলে প্রবেশ করিলাম. তখন বুঝিলাম তাহারা ঐ স্কুলে পড়ে, পাস লইয়া কার্য্য ব্যপদেশে ছুটী লইয়া এইরূপ আচরণ করে। স্কুলে নিয়ত এইরূপ ব্যাপার হইতেছে দেখিলাম। ক্লাসে বসিয়া শিক্ষকের সম্মুখে তাহারা যে সকল আচরণ করে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীরই পড়ার প্রতি মন নাই,

নিরত পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্র ছাত্রীর সহিত আমোদে মত্ত ও কেবল বাহিরে যাইবার সুযোগ অন্বেষণে তৎপর। সুযোগমতে কেহ পাস লইয়া, কেহ শিক্ষকের চক্ষে ধুলি দিয়া ক্লাস হইতে বাহির হয়। আমোদ আহ্লাদের স্থানেরও অভাব নাই। কেন না প্রায় সকল গৃহই মানবশূন্য। যাহাদের নিকটে বাড়ি তাহারা আপন আপন গৃহে গমন করে, যাহাদের বাড়ি দূরে তাহারা নিকটস্থ কোন শূন্য গৃহের চাবি খুলা যায় এমন চাবি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে, তদ্দ্বারা সেই গৃহ খুলিয়া মধ্যে প্রবেশ করে। এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক আঁটাআঁটি করিতেছেন কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এক ক্লাসের ছাত্রী ও ছাত্রকে এক সময়ে ছুটী দেওয়া নিষেধ করিলেন, কিন্ত এক ক্লাস হইতে ছাত্র ও অন্য ক্লাস হইতে ছাত্রী বহির্গত হইয়া একত্রিত হইতে লাগিল। কেহ স্কুলবাটীর বাহিরে যাইতে না পারে তাহার জন্য দ্বারবানের প্রতি কড়া হুকুম প্রদান করিলেন, কিন্ত অসুখ হওয়ার মিথ্যা ভাণ করিয়া ছুটী লইয়া বাটী যাই বলিয়া যুবক যুবতী একত্রিত হয়, এবং অনেকে দ্বারবানদিগকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়া বাহিরে যায়। অনেকে মধ্যে মধ্যে স্কুল কামাই করিয়া আপনাদের দুষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাটীর লোকে জানিল ছেলে মেয়েরা স্কুলে গেল, কিন্ত একটু পরে তাহারা পথ হইতে সঙ্গীসহ ফিরিয়া আইসে। পরে স্কুলে অনুপস্থিত হওয়ার বিষয় পিতামাতাকে জানানর নিয়ম হইল, কিন্ত পিতা-মাতা স্কুলে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অসুখ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগকে নিরুত্তর করিতে লাগিল। যদি পিতা মাতা অধিক কড়াকড়ি করেন তবে তাহারা তাঁহাদের অবাধ্য

হয়। স্বাধীনরাজ্যে কত দিন ছেলে মেয়েরা পিতামাতার অধীনত্ব স্বীকার করিবে? আরও এক সুবিধা আছে—পিতামাতাগণের চাকরী স্থান হইতে আসার অনেক পূর্ব্বে স্কুলের ছুটী হয়। সেই অবসরে সকলে আপন আপন বাটী যাইয়া আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে শৈশব কাল হইতেই মানব ইন্দ্রিয়াশক্ত ও কুকার্য্যরত হয়। অতি অল্প লোকেরই বিদ্যা শিক্ষা হয়। মনে করিয়াছিলাম এ প্রণালীতে অন্য দোষ থাকিলেও যুবক যুবতীর প্রণয়ের গাঢ়তা জন্মে ও তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিবহ করিয়া চির-প্রণয়-সুখ সম্ভোগ করে, কিন্তু দেখিলাম তাহা নহে।—কেননা ইহারা এক জনের প্রতি আশক্ত হয় না, যখন যাহর সহিত সুযোগ হয় তাহারই সহিত কৌতুকে প্রবৃত্ত হয়।

আমি স্কুল ত্যাগ করিয়া আফিস ও সমস্ত চাকরি স্থান ভ্রমণ করিলাম। ঐসকল স্থানের অবস্থা আরও ভয়ানক বোধ হইল। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ও পিতামাতার শাসন থাকায় তথায় তবু যথেচ্ছাচারের কিয়ৎ পরিমাণ অল্পতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু চাকরী স্থানে সেরূপ কোন শাসন নাই, কাযে কাযেই তথায় যথেচ্ছাচারের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। বিশেষতঃ যাহারা ছাত্র অবস্থা হইতে ঐরূপ আচরণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়াছে এমন কি যাহারা শাসন সহ্য না করিয়া পিতামাতার অবাধ্য হইয়া স্কুল ত্যাগ করিয়াছে, তাহরাও এক্ষণে চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের সুযোগের অভাব নাই, তাহারা সাধ মিটাইয়া অভীষ্ট সাধন করিতে তৎপর। বাস্তবিক চাকরী স্থানে যাহা দেখিলাম তাহা দেখিতেও লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়, কোন বেশ্যাগৃহেও সেরূপ জঘন্য ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই।

আফিস সকল বন্ধ হইল, সমস্ত রাস্তা গাড়ি পাল্কি ও

লোকে পরিপূর্ণ হইল। ঘন ঘন ট্রাম গাড়ি চলিতে লাগিল। আমিও সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কেহ গাড়িতে, কেহ পাল্কিতে, কেহ ট্রামগাড়িতে ও কেহ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই গাড়ি পাল্কি সকল বহন করিতেছে। এক খানি পাল্কি চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া-গেল, চাহিয়া দেখিলাম বাহক ও বাহিকাগণের মধ্যে একটী যুবতী অষ্টম কি নবম মাস গর্ভবতী ছিল, পুরুষদিগের সহিত সমানবেগে পাল্কি বহন করায় ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছে। আরোহী বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য পাল্কি লইবেন ও তাহাদিগকে কিছু দিবেন না বলিলেন। সেই জন্য অন্য বাহকগণ তাহার প্রতি চটিয়া উঠিয়া গালিবর্ষণ করিতেছে, তাহার সেবা করা দূরে থাকুক তাহাকে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ লক্ষ লক্ষ দুঃখাবহ ঘটনা দেখিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রতি সদয় হইয়া বা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পরে কি হইল দেখিবার জন্য সেখানে আর থাকিলাম না, চলিয়া গেলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলাম ট্রাম গাড়ির বেগ না থামিতে থামিতে কতকগুলি লোক নামিল, তন্মধ্যে একটী রমণী বেগ সামলাইতে না পারিয়া ভয়ানক বেগে পড়িয়া গেল ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। পূর্ব্বকালে যেমন স্ত্রীলোকদিগের নামিবার বা উঠি-বার সময় ট্রামগাড়ি থামিত এক্ষণে আর সেরূপ থামে না। অনেকে আপনার বিক্রম দেখাইবার জন্য বেগ লাঘবের অপে-ক্ষাও করেন না, পূর্ণবেগবান অবস্থাতেই নামিয়া পড়েন।

এই প্রকার নানা দুর্ঘটনা দেখিতে দেখিতে আমি রাস্তা বহিয়া চলিলাম। সকলেই ক্রমে ক্রমে আপন গৃহে প্রবেশ

করিলেন। যাঁহাদের দাসদাসী আছে তাঁহারা গৃহে যাইয়াই পাদ্য, অর্ঘ্য (তামাক) প্রভৃতি পাইলেন, যাঁহাদের তাহা নাই তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া উদ্যোগ করিয়া লইলেন। অনেকের পুত্র কন্যাগণ অগ্রে স্কুল হইতে আসিয়া কিছু কিছু যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। সকলের এক সময়ে আসা ঘটে না। এই জন্য সকল লোকেরই গৃহের তালার অনেক গুলি করিয়া চাবি রাখিতে হয়, পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা প্রত্যেকেরই নিকট একটী করিয়া থাকে। যিনি যখন গৃহে আইসেন আপনার নিকটস্থ চাবি দ্বারা দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করেন।

এক জন গৃহে আসিয়াই চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ঐ চীৎকার শব্দ শুনিয়া কৌতুহলী হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলাম। জানিলাম কে তাঁহার গৃহের চাবি ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। দেখিলাম কিয়দ্দূরে আর এক জনের গৃহে সিঁদ দিয়া সমস্ত লইয়া গিয়াছে। আর এক গৃহস্থ স্বীয় দশমবর্ষ বয়স্কা কন্যাকে পাইতেছেন না, কোন ব্যক্তি তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরেই এই রূপ নানা প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, কাহারও সর্ব্বস্ব ও কাহারও কিয়ৎপরিমাণ অপহৃত হইয়াছে। কাহারও পুত্র কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় মরিয়া রহিয়াছে, কেহ বা পুত্রের পীড়ার চিকিৎসার সময় পাইয়াও উপায় করিতে পারিতেছেন না; কেননা তাঁহার পতি বা পত্নী অনেক দূরে দোকান করেন, এমন কেহ নাই যে তাহাকে রোগী দুর্ব্বল পুত্রের নিকটে রাখিয়া চিকিৎসক ডাকিতে যাইবেন। কেহ আসিয়া দেখিলেন তাঁহার পত্নীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হওয়ায় সকালে ছুটি করিয়া বাটী আসিয়াছে, কিন্তু লোক অভাবে ধাত্রী

ডাকিতে না পারায় ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। কেহ নিজে পীড়িত হইয়া গৃহে আসিয়াছেন, ভয়ানক গাত্র দাহ, শিরোবেদনা উপস্থিত, সেবা করে—আহা বলে, এমন কেহ নিকটে নাই। যাঁহাদের দাস দাসী আছে, তাঁহাদের এত কষ্ট পাইতে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহাদের সকল বিষয়েই দ্বিগুণ ব্যয় হয়। অনেক দাস দাসী প্রভুর শূন্য গৃহ পাইয়া গৃহের সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করে। অনেক ঘরে দাস দাসীরা গৃহস্থের পুত্র কন্যাদিগকে অসচ্চরিত্র করে।

গৃহীগণের আর একটী বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিলাম। গৃহকার্য্যের সময় সকলে বাড়ি থাকিতে পারে না বলিয়া গৃহকার্য্য লইয়া নিয়ত পরস্পরের বিসম্বাদ হয়। যাহারা আফিসে চাকরী করে তাহারা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কার্য্য করে অবশিষ্ট সময়ে বাটীতে থাকে, কিন্তু যাহারা দোকান করে বা দোকানদার প্রভৃতির ঘরে চাকরি করে তাহারা প্রায়ই প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কার্য্যস্থানে থাকে, মধ্যাহ্ন সময়ে একবার মাত্র ভোজন করিতে আইসে। রন্ধনাদির জন্য প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে তাহারা গৃহে থাকিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে গৃহকর্ম্মাদি ও রন্ধন লইয়া নিয়তই কলহ হয়। প্রাতঃকাল ও রাত্রির কার্য্য বন্ধ করিলেও তাহাদের চলে না। কেন না আফিসের লোকেরা ঐ সময়ে ক্রয়াদি করিবার সুবিধা পান, ঐ সময়েই দোকানদার ও ফিরিওয়ালাদের বিক্রয় অধিক হয়। এই জন্য যে স্ত্রী পুরুষের এক জন আফিসের কার্য্য ও অপর জন চাকরী করে তাহাদের মধ্যে গৃহকার্য্য লইয়া ভয়ানক বিবাদ হয়। মধ্যাহ্ন সময়েও দোকানে কার্য্য অল্প নহে, সেই জন্য সে সময়েও তাহারা গৃহে থাকিয়া গৃহরক্ষণাদি করিতে পারে না। তাহা পারি-

লেও যথেষ্ট সাহায্য হইত ও পরস্পরের বিবাদ মিটিয়া যাইত। কিন্তু সে সময়েও তাহারা কার্য্যস্থান ত্যাগ করিতে পারে না।

সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে চৌর্য্যাদির ভয় আরও অধিক। কেন না তথাকার অধিক লোকই বিদেশে থাকে ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা প্রায়ই মাঠে কার্য্য করে, গ্রাম প্রায় শূন্যই থাকে। শূন্য পল্লীতে চুরী করিবার বড় সুবিধা। কৃষকগণ দ্রব্য সামগ্রী রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া সকল দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে রাখে। তাহারা এক এক খানি ক্ষুদ্র দোচালা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যখন যে ক্ষেত্রে কার্য্য করে সেই খানি সেই ক্ষেত্রে লইয়া যায় ও তন্মধ্যে আপনাদের দ্রব্য সামগ্রী গুলি রাখিয়া দেয়। শিশু সন্তান গুলি নিকটেই থাকে। গৃহে কিছুই রাখিয়া আইসে না, সমস্ত দ্রব্যই বহন করিয়া মাঠে মাঠে ভ্রমণ করে। কিন্তু যাহাদের মোট বহন ব্যবসায় তাহাদের বড় কষ্ট। পরের মোটের সঙ্গে তাহাদিগকে নিজের কেঁথা কাপড় গুলিও বহিয়া লইয়া যাইতে হয়। তাহাদের সন্তানগণের আরও কষ্ট; শূন্য গৃহে তাহাদিগের থাকিবার স্থান নাই, সুতরাং তাহাদিগকে পিতা মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিয়ত ভ্রমণ করিতে হয়। নগর ও পল্লী উভয় স্থানেই এই শ্রেণীর লোকদেরর বড় অসুবিধা।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানবগণ নানা উপায় চিন্তা করিল, অনেক সভা ও অনেক বক্তৃতা হইল। পাহারাওয়ালার সংখ্যা চারি পাঁচগুণ বৃদ্ধি করা হইল, গৃহ সকলের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য প্রতি পল্লী ও নগরাংশে বহু লোক নিযুক্ত হইল, কিন্তু কিছুতেই মানবের কষ্ট গেল না, প্রত্যুত নিয়ত অসংখ্য মকদ্দমার সৃষ্টি হইতে লাগিল ও ঐ সকল কার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে স্বতন্ত্র গৃহ বাস প্রথা উঠিয়া

যাওয়াই যুক্তি যুক্ত বলিয়া স্থির হইল। সকলেই বিবেচনা করিলেন হোটেলে বাস করার প্রথা হইলে কর্ম্মের জন্য পরস্পরের বিবাদ হইবেনা, কাহারও দ্রব্যাদি চুরি হইবে না ও সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণের কোন অসুবিধা থাকিবে না। হোটেলে বাস করিতে হইলে ব্যয় অধিক হইবে বটে. কিন্তু সকলেরই আয় বাড়িবে। কেন না সকলেই আপন আপন আবাস বাটী বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইবেন তদ্দারা ব্যবসায়াদি করিতে পারিবেন, গৃহ কার্য্য করিতে যে সময় বৃথা নষ্ট হয় সে সময়ে আয় বৃদ্ধির উপযোগী কার্য্য করিতে পারিবেন এবং বহু সংখ্যক হোটেল হইলে তৎসমস্তের জন্য বহুতর রসুয়ে, চাকর, দ্বারবান. বাজারসরকার, বিলসরকার প্রভৃতি অনেক লোক আবশ্যক হইবে. সুতরাং চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে; সেই সকল চাকরী করিয়া লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ভাল ভাল পণ্ডিতগণ ফর্দ ধরিলেন ও আঁক কসিলেন। রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য করিতে লোকের যে সময় নষ্ট হয় সে সময়ে কার্য্য করিলে যত আয় হইতে পারে দেখিলেন, গৃহবিক্রয়লব্ধ টাকার কত সুদ হইতে পারে তাহা ধরিলেন ও হোটেলে খাইলে যে ব্যয় বাড়িতে পারে তাহাও ধরিলেন। পরিশেষে জমা খরচ করিয়া দেখিলেন যথেষ্ট আয় বেসি থাকিল। বিজ্ঞান, থিয়োরি (Theory) সমস্তই প্রয়োগ করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন এই প্রণালী অনুসারে চলিলে মানবের আয় বাড়িবে—শান্তি বাড়িবে—সর্ব্ব প্রকারে মানব সুখী হইবে। সকলেই মহানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। আইন প্রচার হইল অদ্যাবধি কেহ আর স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিতে পারিবেন না, সকলকেই হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয় দৃশ্য।

চমৎকার দৃশ্য! কি পল্লীগ্রাম কি সহর সর্ব্বত্রেরই দৃশ্য অতি মনোহর। সকল স্থানই বড় বড় অট্টালিকায় পরিপূর্ণ। কোন স্থানেই এক খানি কুটীর দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃহৎ বৃহৎ গৃহে অসংখ্য নর নারী এক সঙ্গে বাস করে। অবস্থা অনুসারে কাহারও একটী কাহারও দুইটী ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে, কেহ বা এক ঘরের অর্দ্ধেক বা চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সেই ঘরে তাঁহারা সপুত্র সপরিবারে বাস করেন। হোটেলে নানাপ্রকার অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, যাঁহার যেমন অবস্থা তদনুসারে সকলেই ভোজনাদি করিয়া আপন আপন কার্য্যস্থানে চলিয়া যান। শিশু সন্তানগণ হোটেলের দাস দাসীর জিম্মায় থাকে। যাঁহার যে সময়ে সুবিধা তিনি সেই সময়ে আহার করেন ও কার্য্য করিতে যান এবং সুবিধা হইলেই ফিরিয়া আইসেন। কোন অসুবিধাই নাই; সকলেই নিয়ত উপার্জ্জন ও উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। নিশ্চয়ই স্থির করিলাম এইবার বাস্তবিক মানব সুখী হইল। কিন্তু কিছু দিন পরে সমুদায় আশা বিফল হইল। যখন হোটেলকর্ত্তারা বিল করিলেন তখন দেখিলাম অনেক লোকের আয়ের দেড়গুণ দ্বিগুণ বিল হইয়াছে। বিল দেখিয়া সকলেই চমকিয়া গেল! আয় বাড়িবার যে আশা হইয়াছিল কার্য্যতঃ কাহারও তাহা হয়নাই, ব্যয়ই বাড়িয়াছে। কেন না বাটী বিক্রয় করিয়া কেহ কিছু পান নাই, কারণ সকলেই বিক্রয়কারক, ক্রয়কারক কেহ নাই। যে সকল বাড়ী হোটেল ও দোকান

আদি হইবার উপযুক্ত তাহারই কতকগুলি মাত্র বিক্রীত হইয়াছে, আর কোন বাড়িই বিক্রয় হয় নাই; যেগুলি বিক্রীত হইয়াছে তাহাও নিতান্ত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে; সুতরাং কাহারও মূলধন বাড়ে নাই। চাকরি বৃদ্ধি হইবে যে আশা করা হইয়াছিল তাহাও নিষ্ফল। কেন না পূর্ব্বে গৃহকার্য্য করিতে যত লোকের প্রয়োজন হইত হোটেল সকলে তত লোকের আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বে মধ্যবিৎ ১০টী গৃহস্থের যত দাস দাসী ছিল এক্ষণে যে হোটেলে শত গৃহস্থ বাস করে তথায় তাহাও নাই। দরিদ্র ধনী গড় করিয়া পূর্ব্বে শত লোকের যত চাকর ছিল এক্ষণে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও লোকের কার্য্য আদৌ বাড়ে নাই। কারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র দোকানের সংখ্যা এক কালে কমিয়া গিয়াছে। দরিদ্র গৃহস্থগণ আধ পয়সা, সিকি পয়সার পর্য্যন্ত দ্রব্য ক্রয় করিত, এবং অনেকের দাস দাসী না থাকায় তাহারা ফিরিওলাদের নিকট দ্রব্য কিনিত, এই জন্য পূর্ব্বে অনেক অনেক ক্ষুদ্র দোকানদার ও ফিরিওয়ালা ব্যবসায় করিয়া জীবন ধারণ করিত, এক্ষণে সে সকলের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে হোটেলাধিপতিগণ বহু পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করেন, তাঁহারা সস্তা পাইবার আশয়ে বড় বড় পাইকিরি দোকান হইতেই দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। সুতরাং বহুতর ক্ষুদ্র দোকান একেবারে উঠিয়া গিয়াছে ও বহুতর ফিরিওয়ালা কার্য্যশূন্য হইয়াছে। আবার হোটেলাধিপতিগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া সস্তা করিবার জন্য অল্প ব্যয়ে কার্য্য সম্পন্ন করিবার নানা উপায় আবিষ্কৃত করিতেছেন। এমন কল প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার সাহায্যে একজনে দুই শত ব্যক্তির অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারে, এক জনে দুই শত ব্যক্তির

খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের অধিক লোকের আবশ্যক হয় না। কিন্তু ঐ সকল কল ক্রয় করিতে অধিক ব্যয় পড়ে, সেই জন্য সেই টাকার সুদ প্রভৃতিতে মাসিক যে খরচ ধরা হয় তাহা চাকরের বেতন অপেক্ষা বড় অল্প নয়। সুতরাং অল্প লোক দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার সুবিধা দরিদ্রগণ পান না। হোটেলবাসী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মুলধনের সুদ, বাটীভাড়া, চাকর চাকরাণী প্রভৃতির বেতন ও হোটেলাধিপতির লাভ প্রভৃতি অংশ মত দিতে হয়। তাহাতে ধনীগণের পক্ষে কিছু ব্যয় লাঘব হয় বটে কিন্তু দরিদ্রগণের স্কন্ধে সমধিক ব্যয়ভার পতিত হয়। কেননা দরিদ্রগণ কখনও চাকরের বেতন দিত না, কোন প্রকার পরিশ্রমিক ব্যয়ই তাহাদের ছিল না; তাহারা মুল দ্রব্য গুলি ক্রয় করিয়া আনিয়া আপনারা পরিশ্রম করিয়া নানা কৌশলে অতি অল্প ব্যয়ে আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত, এমন কি অনেকে আপন আপন বাস গৃহও প্রস্তুত করিয়া লইত। বিশেষতঃ দম্পতীর মধ্যে যে উপার্জ্জনশালী নহে সে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়া ব্যয় কমাইয়া আয় বৃদ্ধির কার্য্য করিত। এক্ষণে তাহাদের আর সে সকল সুবিধা নাই, এক্ষণে সকল কার্য্যেরই ভার হোটেলাধিপতির উপর। মুল্য দিয়া তাঁহার নিকট খাদ্য ক্রয় করিয়া খাইতে হইবে, ভাড়া দিয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতে হইবে। তিনি ধনী দরিদ্র সকলেরই নিকট সমানরূপ পারিশ্রমিকাদির ব্যয় লয়েন। সুতরাং দরিদ্রগণ অতি জঘন্য দ্রব্য আধপেটা খাইয়া কোনও প্রকারে দিন পাত করে। যে সময়ে দরিদ্রগণ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যয় লাঘবের চেষ্টা করিত সে সময়ে অন্য কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেও পারিতেছে না। কেননা কার্য্যসংখ্যা ও পরিশ্রমের মূল্য

কমিয়াছে বই বৃদ্ধি হয় নাই। দম্পতীর মধ্যে যাহার উপার্জ্জন নাই বা যাহার উপার্জ্জন অতি অল্প তাহার কষ্টের সীমা নাই। তিনি হোটেলের দেনার নিজ দেয় অর্দ্ধেক দিতে না পারিয়া বিষম যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়েন। অনেক স্থলেই ঐ কারণে বিবাহ ভঙ্গ হইতে লাগিল। দেখিলাম ব্যভিচারই স্ত্রীজাতির জীবিকার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। ধনহীনা রমণীগণ প্রকাশ্য বেশ্যা বৃত্তি করিয়া বা গোপনে ব্যভিচার করিয়া কোন প্রকারে উদরান্নের সংস্থান করে। অনেককে পেটের দায়ে নিতান্ত লজ্জাহীনা হইতে হয়। তাহাদের আচরণ দেখিলে মনুষ্য নামে ঘৃণা হয়। যে দম্পতীর উভয়ই উপার্জ্জনশীল তাঁহাদের মধ্যেও ব্যভিচার অল্প প্রবল নয়। তাঁহারা উভয়েই উপার্জ্জনক্ষম, উভয়েই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যস্থানে কার্য্য করেন ও আপন আপন সুবিধার জন্য পৃথক্ পৃথক্ হোটেলে অবস্থিতি করেন। মনের সকল রকম ইচ্ছাই তাঁহারা সম্পন্ন করিবার জন্য নিয়ত সুবিধা পান।

লোকের একটী বড় অসুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে অনেক লোক ভিক্ষা অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, অনেকে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিত এবং অনেকে ঋণ গ্রহণ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইত। ঋণ করিয়া অনেকে ব্যবসায়াদি করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এক্ষণে সে সকলের কিছুই হইবার যো নাই। এক্ষণে গৃহস্থ নাই মুষ্টিভিক্ষাও নাই। দুই একটী সাধারণ দানাশ্রম আছে বটে কিন্তু তথাকার হৃদয়শূন্য দানে প্রকৃত দরিদ্রের উপকার হয় না। দানাশ্রমের

অধিকাংশ অর্থ কর্ম্মচারীরাই গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট তাঁহাদের পরিচিত ও স্বার্থসাধনক্ষম ব্যক্তিরাই গ্রহণ করে। আত্মীয় বন্ধুগণ এখন প্রায়ই আত্মীয় বন্ধুর উপকার করেন না। আত্মীয় বন্ধুর নিকট উপকার প্রার্থনাই এক্ষণকার সমাজে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া গণ্য। এক্ষণে সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের মনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন সমস্ত আত্মীয়তা মুখে মুখেই সম্পন্ন হয়, কেহই হৃদয়ের কার্য্য করেন না। প্রত্যুতঃ সকলের হৃদয়ের ভাব মৌখিক বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন অপর কেহ কোন ভদ্র-লোকের সহিত কথাই কহিতে পারেন না—আত্মীয়ের সেই অধিকার টুকু মাত্র আছে। তাঁহারা কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা হইলে "মহাশয় ভাল আছেন ত?" এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। কিন্তু পাঁচ দিন অনাহারে থাকিলেও জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি 'ভাল আছি' বলিতে বাধ্য হয়েন। যদি কেহ কোনরূপ কষ্টের কথা জানান তাহা হইলে 'বড় দুঃখিত হইলাম' (very sorry) বলিয়া তাহার দুঃখ নিবারণ করেন। অতি সামান্য দুঃখেরও ঐ প্রতিকার সর্ব্বস্বান্তদুঃখেরও ঐ প্রতিকার। দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ প্রতিকার পাইয়াই ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হয়েন। ধন্যবাদ দেওয়া এক্ষণে নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে গণ্য; কারণ না থাকিলেও ধন্যবাদ দিতে হয়। পিতা মাতা পুত্রকে এবং প্রভু ভৃত্যকে দিনের মধ্যে সহস্র বার ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। যে ভৃত্য প্রভুর যে কার্য্য জন্য নিযুক্ত ও যে কার্য্যের কিঞ্চিৎ ত্রুটী হইলে প্রভু ভৃত্যকে প্রহার, বেতন কর্ত্তন বা কার্য্য হইতে অবহৃত করেন সেই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য করন জন্যও প্রভু নিয়ত দাসকে ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। অধিক কি স্তন্যপায়ী শিশু স্তন্য পান

জন্য মাতাকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। এখন হৃদয়বিরুদ্ধ বাহ্যিক কার্য্যের এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে যিনি যে কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখুন না কেন 'আপনার একান্ত, অনুগত দাস,' এই কথাটী নিম্নে ও 'মাননীয় মহাশয়' এই কথাটী শীর্ষে লিখিতেই হইবে। দেশের সম্রাট মেথরকে লিখুন, পিতা পুত্রকে লিখুন বা গুরু শিষ্যকে লিখুন সকলকেই ঐরূপ লিখিতে হইবে। এইরূপ হৃদয়শূন্য সম্ভ্রম ও আত্মীয়তাতেই মানব মুগ্ধ। প্রকৃত হিত কেহ কাহারও করেন না। যিনি সেরূপ আশা করেন তিনি একান্ত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

ঋণ পাওয়াও এক্ষণে সহজ ব্যাপার নহে। পূর্ব্বে সকলেরই কিছু না কিছু সম্পত্তি ছিল, যে অতি দরিদ্র তাহারও অন্ততঃ এক খানি বাসগৃহ ও ২। ৪ খানি বাসন থাকিত। লোকে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া অথবা সুদ পাইবার লোভে ঐ প্রতিভূতেই তাহাদিগকে যথাসম্ভব কিছু কর্জ্জ দিত। বিশেষতঃ বাসস্থান ও আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া হঠাৎ অন্য স্থানে যাইতে পারিবেনা এই বিশ্বাস থাকায় দেয় টাকা আদায় হইবার ভরসায় লোকে টাকা দিতে বড় কুণ্ঠিত হইত না। এক্ষণে কাহারও গৃহ বা বাসন কিছুই নাই। অনেকের পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত নাই। হোটেল হইতে কাপড় ভাড়া করিয়া লইয়া অনেকে কার্য্য চালায়। সুতরাং বন্ধক দিবার উপযোগী নিজের কাহারও কিছুই নাই। তায় আবার সকল সময়ে লোকে এক হোটেলে বাস করে না। যখন যে হোটেলে থাকিলে কার্য্য সুবিধা হয় কিম্বা যে হোটেলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে থাকিতে পারে সেই হোটেলে গমন করে। দেনার ভয়েও লোকে নিয়ত হোটেল পরিবর্ত্তিত করে। সুতরাং কাহারও সহিত কাহারও প্রতিবাসীর ভাবও নাই। এই সকল

কারণে কেহ কাহাকে এক পয়সারও বিশ্বাস করে না। হোটেলাধিপেরাও নগদ টাকা ভিন্ন আহারীয় বা বাস স্থান দিতে সম্মত নহেন। যাঁহাদের ভালরূপ চাকরী বা ভালরূপ ব্যবসাকার্য্য আছে তাঁহারা হোটেলে ধার পান বটে কিন্তু তাঁহাদের সহিতও হোটেলাধিপগণের অনেক গোলমাল হয়। যে দম্পতির উভয়ের উপার্জ্জন নাই সে দম্পতীর উভয়ের দেনাই একজনের অর্থাৎ যাহার উপার্জ্জন আছে তাহার নিকট হইতে লইবার চেষ্টা হয়, অনেকে তাহা দিতে সম্মত হয়েন না। কাযেই হোটেলাধিপতিকে তজ্জন্য নালিশ করিতে হয়। নিয়ত এরূপ বহুতর মকদ্দমা হইতেছে। ঐ সকল মকদ্দমায় পতি পত্নী সম্বন্ধীয় যে সকল অশ্লীল কথা প্রকাশিত হয় তাহা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। ঐ সকল কথা সত্য হইলেও আশ্চর্য্য মানবচরিত্র মিথ্যা হইলেও আশ্চর্য্য মানবচরিত্র।

এক দিন আমি আদালতে গিয়া অনেক গুলি মকদ্দমার বাদ প্রতিবাদ শুনিলাম। দেখিলাম সকল মকদ্দমাতেই স্বামী স্ত্রীর প্রতি দোষারোপ করিতেছে ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি দোষারোপ করিতেছে। ব্যভিচারের প্রতিবাদই অধিক।

একটী মকদ্দমায় পুরুষ কহিলেন তাঁহার পত্নী অসচ্চরিত্রা ও তাঁহার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে তাহার একটীও তাঁহার ঔরস জাত নহে সুতরাং ঐ সকল পুত্র কন্যার ভরণ-পোষণের দায়ী তিনি নহেন। পত্নী তাহার উত্তরে পতির ব্যভিচারের কথা বলিলেন। উভয়েই আপন আপন বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য অনেক সাক্ষী দিলেন। সাক্ষীদের কথা শুনিয়া আমার পেটের ভাত চাউল হইয়া গেল। পরে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইলে স্বামীর পক্ষের উকীল বলিলেন স্বামী

ব্যভিচারী কি না তাহা এ মকদ্দমায় আদৌ দেখিবার আবশ্যক নাই, স্ত্রীর ব্যভিচার সত্য কি না তাহা দেখাই এ মকদ্দমার প্রধান আবশ্যক। কারণ যদি প্রণয়ের সুব্যবহার হয় নাই বা দাম্পত্য ধর্ম্ম যথাবিধি রক্ষিত হয় নাই বলিয়া বিবাহ ভঙ্গের অভিযোগ হইত, তাহা হইলে স্বামীর চরিত্রও দেখা আবশ্যক হইত; কিন্তু এ মকদ্দমা পুত্রের ভরণপোষণের অংশ জন্য। যদি সপ্রমাণ হয় সন্তান আমার নয় তবে আমি তাহার অংশ দিব কেন? স্বামী ব্যভিচারী হইলে ত পরের সন্তান ঘরে আনিতে পারে না ও তজ্জন্য স্ত্রীকে কোনরূপ দায়ী করে না; কিন্তু স্ত্রীর ব্যভিচার দ্বারা অন্যের সন্তান গৃহে আইসে। আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি স্ত্রী ব্যভিচারিণী সুতরাং তাহার গর্ভজাত সন্তান আমার মক্কেলের ঔরসজাত না হইবার যথেষ্ট সম্ভব। যদি তাহা হয় তবে কি জন্য আমার মক্কেল পরের সন্তানের ভরণপোষণের দায়ী হইবে? যদি স্ত্রীর কথানুযায়ী আমার মক্কেলকেও ব্যভিচারী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাতে এ মকদ্দমার কোন উপকার বা হানি হয় না। কারণ তদ্দারা অন্যের সন্তান পালন ভার স্ত্রীর উপর পড়িতেছেনা। স্ত্রীর উকীল কহিলেন পতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন আর রমণী ইন্দ্রিয় দমন করিবে এই কি সাম্য ভাব? না ইহাকে স্ত্রীস্বাধীনতা বলে? পতি ব্যভিচারী না হইলে পত্নী কখনও ব্যভিচারিণী হইত না। পতির দোষই পত্নীর ব্যভিচারের মূল কারণ সুতরাং তাঁহাকে রমণীর গর্ব্ভজাত পুত্রের ভরণপোষণের দায়ী হইতে হইবে। পতির উকীল কহিলেন যদি অন্যের সন্তান গর্ব্ভে ধারণ না করে তবে ব্যভিচারী স্বামী পত্নীর

ব্যভিচার অনুমোদন করিতে বাধ্য অর্থাৎ স্বামীর ব্যভিচার দ্বারা স্ত্রীর যে অনিষ্ট হইতে পারে স্ত্রীর ব্যভিচারোৎপন্ন সেই পরিমাণ অনিষ্ট স্বামীকে অবশ্য সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু অতিরিক্ত ভার তাহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করা কোন্ যুক্তির অনুমোদিত? স্বামীর ব্যভিচারে পত্নীকে অন্যের পুত্র পালন ভার গ্রহণ করিতে হয় না, কিন্তু পত্নীর ব্যভিচার অনুমোদন করিলে জারজ ও হীন বংশ জাত অপকৃষ্ট সন্তানকে আপনার সন্তান নামে পরিচিত করিয়া ঘৃণাস্পদ হইতে হয় ও তাহার পালন ভারে প্রপীড়িত হইতে হয়। এ অন্যায় ভার স্বামী বহন করিবে কেন? এরূপ হইলে কি সাম্য থাকে? না এরূপ হইলে পুরুষের কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাধীনতা আছে বলা যায়?

আর একটী মকদ্দমার বাদ প্রতিবাদ শুনিলাম। তাহাতে পতি কহিলেন পত্নীকে দুশ্চারিণী জানিয়া আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, বিবাহ ভঙ্গের আদেশ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি তাহার পুত্রের ভরপোষণের দায়ী নহি। পত্নী কহিলেন পতি আমাকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং সে গর্ভজাত সন্তান ও তৎ পূর্ব্ব জাত সন্তানের ভরণ পোষণ তাঁহাকে করিতে হইবে। পতি কহিলেন তাহার দায়ী আমি নহি, কারণ কোনও সন্তানই আমার ঔরসজাত নহে। এ মকদ্দমাতেও উভয় পক্ষের অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইল।

এক হোটেলাধিপ একটী ধনবানের কন্যার নাম সংযোগে তাহার দরিদ্র পতির নামে নালিশ করিয়াছেন; ঐ কন্যা বলিলেন তাহার স্বামী অত্যন্ত দুশ্চরিত্র, তজ্জন্য তাহার দেনার জন্য আমার নামে নালিশ হইতে পারে না, আমার

দেয় অর্দ্ধেক আমি পরিশোধ করিয়াছি। তাহার স্বামী আপনার দুশ্চরিত্রতার বিষয় অস্বীকার করিয়া কহিলেন আমার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, তাই স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য এই মিথ্যা বাক্য বলিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে রমণীই নিতান্ত দুশ্চরিত্রা। আমি জানিয়াও কিছু বলিনা, কারণ আমার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, মনে মনে ভাবিতেছি, আহার চলিতেছে এই আমার পরম লাভ। উহাকে পরিত্যাগ করিলে আমার আহার চলিবে না। নচেৎ আমি অনেক দিন পূর্ব্বে বিবাহ ভঙ্গের প্রার্থনা করিতাম। এই বলিয়া রমণীর দুশ্চরিত্র সপ্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী দিল। তাহারা যাহা বলিল তাহা শুনিয়া এমন পাষণ্ড কেহ নাই যে কর্ণে হস্ত প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে। লজ্জাশীলা ও কোমল-হৃদয়া রমণী যে এমন নির্লজ্জ ও পাষণ্ড হইতে পারে ইহা অমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

সকল মকদ্দমাতেই এইরূপ নানা প্রকার অশ্লীল বাদ প্রতিবাদ শুনিলাম। ঐ সকল মকদ্দমার সাক্ষীরা যে সকল অশ্লীল ও অমানুষ ব্যাপারের সাক্ষ্য প্রদান করিল তাহা কোন ভদ্রলোকই শুনিতে পারেন না। আমি সে সকল শুনিতে না পারিয়াই চলিয়া আইলাম। সে সকল পরিচয় দিব কি স্মরণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। প্রতি দিন এইরূপ ও অন্যান্য নানা রূপ মকদ্দমা হইয়া অর্থী প্রত্যর্থী উভয়েই ভয়ানক জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছে। দেওয়ানি জেল দেনাদার বন্দীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অক্ষম সক্ষম উভয় প্রকার লোক দ্বারাই বন্দীগৃহ পরিপূর্ণ। অনেকে অক্ষম স্ত্রী কি স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া জেলে যান। অভিপ্রায় এক্ষণে তাহারা যাহা

দেনা করিবে তাহার দায়ী তিনি হইবেন না জানিয়া কেহ তাহাদিগকে ধার দিবেন না। জেলে গেলে চাট্টি খাইতে পাইবে এই ভরসায় অনেক দরিদ্র ইচ্ছা করিয়া জেলে যায়। অনেকে অসম্পন্ন সপ্রমাণ করিয়া রাজার অভয় গ্রহণ করে অর্থাৎ দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়া দেনার দায় হইতে অব্যাহতি পায়। মহাজনদিগের টাকা আদায় হয় না কেবল ব্যয় করা সার হয়। এই সকল কারণে মাহাজন ও হোটেল-পতিরা আর নালিশ করিতে চাহেন না। তাঁহারা এক্ষণে এক কালে ধার দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। লোকের দুঃখ অতি মাত্রায় বাড়িয়া গেল। কি দম্পতীপ্রেম, কি সন্তানবৎসলতা, কি পিতৃভক্তি, কি বন্ধুসৌহার্দ্দ, কি প্রতিবেশীসহানুভূতি সকল প্রকার সুখ হইতেই মানব বর্জ্জিত হইল, কেবল পেটের দায়েই নিয়ত বিব্রত।

এইরূপ ও অন্যান্য নানা প্রকার দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া মানব সমাজ বিচলিত হইল। তখন দুঃখ দূর করিবার উপায় অবধারণ জন্য স্থানে স্থানে বহুতর সভা সংস্থাপিত হইল। প্রকৃত কারণানুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কমিসন বসাইলেন। কমিসনগণ অনেক অনুসন্ধান করিলেন, অনেক লোকের জবানবন্দী লইলেন ও পরিশেষে বৃহৎ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে বিবাহ প্রথাই মানবের সকল দুঃখের মূল। কারণ দম্পতীর উভয়েই কখনও সমান গুণ ও সমান শক্তি সম্পন্ন হয় না। সেই জন্য তাহারা পরস্পরে বিবাদ করিয়া মানব সমাজের এবম্বিধ দুঃখ বর্দ্ধন করিতেছে। দম্পতীর মধ্যে যিনি অধিক উপার্জ্জন-শালী তিনি প্রভুত্ব করিছে, না পারিলে অন্যের ভার বহন

করিতে চাহেন না, কিন্তু যিনি অক্ষম তিনি অধীনতা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন, উপার্জ্জনও করিতে পারেন না। ইহাই বিবাদের মূল কারণ। বিবাহ ভঙ্গ করিলেও সে বিবাদ মিটে না; কারণ সন্তানগণের ভরণপোষণ লইয়া তাহাদের মধ্যে চির বিবাদ থাকে। সুতরাং এমন উপায় করা আবশ্যক যাহাতে কি স্ত্রী কি স্বামী সকলেই স্বাধীন ভাবে আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, কেহ যেন অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়।

কমিসনেরা রিপোর্ট দিলে উহার উপায় অবধারণ করিবার জন্য এক মহা সভা স্থাপিত হইল। সভ্যগণ অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলেন অর্থের সহিত সসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের কোন প্রকার সংস্রব না থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কেন না অর্থই যত অনর্থের মূল। যেমন বিষয়কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সংস্রব রাখিলে অর্থ বা ধর্ম্ম কিছুরই উন্নতি হয় না, সেইরূপ প্রণয়ের সহিত অর্থ সংস্রব থাকিলে প্রণয় বা অর্থ কিছুরই উন্নতি হয় না। "ধর্ম্মের সহিত অর্থের সংস্রব রাখা উচিত নয়" এই তত্ত্ব ইংলণ্ডবাসীগণ বহু পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের এত উন্নতি হইয়াছে। নির্ব্বোধ ভারতীয়গণ তাহা না বুঝাইতেই অধঃপাতে গিয়াছেন। ধনের জন্য জ্ঞাতি-বিরোধ, পিতা পুত্রে বিরোধ ও পতি পত্নীতে বিরোধ হয়। অমৃত বিষ ও বিষ অমৃত হয়। ইহা বুঝিয়াই পাছে আত্মীয়কে টাকা ধার দিলে পরস্পরের মনান্তর হয়, এই ভয়ে এক্ষণে কেহই মহাবিপদ সময়েও আত্মীয়কে অর্থ সাহায্য করেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পরম আত্মীয় পিতা পুত্র, পতি পত্নী প্রভৃতির মধ্যে সকলেই নিয়ত অর্থসংস্রব রাখেন ও সংসারকে দুঃখময় করেন; আমাদের মতে কি স্ত্রীপুরুষ কি পিতা পুত্র কাহারও

মধ্যে আর কোন বিষয় সংস্রব রাখা উচিত নয়। সকলে যেমন কার্য্য সম্বন্ধে ও মতামত সম্বন্ধে স্বাধীন অর্থ সম্বন্ধেও সকলেরই সেইরূপ স্বাধীন হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে মনুষ্য যাহা উপার্জ্জন করিবে সে তাহা ইচ্ছামত ব্যয় করিবে, সে অর্থের বা সে অর্থ জন্য সুখ দুঃখের ভাগী স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, কন্যা কেহই হইবে না। এইরূপ হইলেই মানব প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাবলম্বী হইবে, প্রকৃত পক্ষে মানবের স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে ও সকলে প্রকৃত সুখী হইবে! পরস্পর অর্থসাপেক্ষ হইলে স্বাধীনতা মানবের নাম মাত্র হয়। পূর্ব্বে কালে ভারতবাসীগণের মধ্যে এক জন উপার্জ্জন করিতেন ও ভ্রাতা ভগিনী শ্যালক, ভগ্নিপতি, ভাগিনেয়, ভ্রাতুস্পুত্র, দৌহিত্র সকলেই তাহা বিভক্ত করিয়া খাইতেন, উপার্জ্জন কারীকে সমস্তই, ভাগ বিলি করিয়া দিতে হইত, তাঁহার ভাগ্যে কিছুমাত্র সুখ ঘটিত না, কোন প্রকার উন্নতিও তিনি করিতে পারিতেন না, এবং যাঁহারা বসিয়া খাইতন তাঁহারাও এককালে অধঃপাতে যাইতেন ও সম্পূর্ণ ভাবে উপার্জ্জনকারীর অধীন হইয়া থাকিতেন। তাই ভারতের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছিল। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে সকলেই স্বাবলম্বী ছিলেন, তাই তাঁহাদের এত উন্নতি হইয়াছিল। আমরা সেই আদর্শে চলিতেছি বটে, কিন্তু আমরা প্রকৃত পক্ষে স্বাবলম্বী হই নাই। কেন না এখনও স্ত্রী ও স্বামী এবং পিতা ও পুত্র পরস্পর পরস্পরের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করে; যদি সকল মনুষ্যই অন্যের আশা না করিয়া আপন আপন উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে সকলেই উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হয়, এবং আপন শক্তির অনুরূপ অবস্থায় থাকিতে অভ্যস্ত হয়। কোন অক্ষম ব্যক্তিকেই পিত্রাদ্দির উৎকৃষ্টাবস্থায় থাকিয়া অভ্যস্ত

হইয়া শেষে চিরকাল অনভ্যস্ত কষ্ট ভোগে দিন যাপন করিতে হয় না। উপার্জ্জনকারীকেও পরের জন্য সমস্ত ব্যয় করিয়া শেষ জীবনে অর্থাভাব জনিত দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে হয় না। যদি এরূপ নিয়ম হয় যে কেহ কাহাকেও কোন প্রকার সাহায্য করিবে না, তাহা হইলে সকলের সমস্ত দুঃখ বিদূরীত হইবে ও পৃথিবী অতি অল্প দিনেই উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিবে।

সভার মন্তব্য প্রকাশিত হইলে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইল, ও আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইল। অনেক দিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক হইয়া যাহা আইনরূপে পাস হইল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—

হেতুবাদ।—মানবজাতির দুঃখ দূর করিবার ও প্রকৃত সুখ বিধান করিবার ও মানবের প্রকৃত উন্নতি হইবার উপায় অবধারণ করিবার জন্য এই আইন প্রস্তুত হইল। কিন্তু মানব বলিতে কোন বিশেষ মানব (Individual) বুঝিতে হইবে না, মানব সমষ্টি বুঝিতে হইবে। সুতরাং এক জন, দুই জন কি দশ জন, অথবা লক্ষ, কোটী, অর্ব্বুদ, ব্যক্তিরও সুখ দুঃখের জন্য এই আইন দায়ী নহে। সমগ্র মানব সমষ্টির সুখ দুঃখের জন্যই এই আইন দায়ী।

১। যিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন তিনি তাহা একা ভোগ করিবেন, অন্য কাহাকেও সম্পূর্ণ বা তাহর কোন অংশ দান করিতে পারিবেন না। যিনি ইহার বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন তিনি মানবের ধনহর্ত্তা স্বরূপে গণ্য হইয়া তস্করের উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে, নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতে কিম্বা পিতা মাতা, কি পুত্র কন্যা কি স্বামী স্ত্রী কাহাকেও কোনরূপ অর্থ, ভোজ্য বা অন্য কোনরূপ দ্রব্য প্রদান

করিতে এই আইন দ্বারা নিষেধ করা হইল। সে সকল আবশ্যক কর্ম্ম গবর্ণমেণ্ট সম্পন্ন করিবেন। সকল ব্যক্তিকেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশ কর (Tax) স্বরূপ দিতে হইবে।

২। বিবাহ করুন আর নাই করুন সকলকেই ঐ জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ কর দিতে হইবে।

বিবাহ বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে স্ত্রী পুরুষ ইচ্ছামত প্রণয়াদি করিবেন। তাহার জন্য কেহ কাহাকে কিছু দান বা সহায়তা করিবেন না। অন্য সকল বিষয়ে তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে চলিতে পারিবেন।

৩। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে দাখিল হইবে। কেহ উত্তরাধিকার বা উইল কি দান ক্রমে কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও সম্পত্তি পাইবেন না।

৪। কেহ পতি, পত্নী, পুত্র বা কন্যা কাহারও ভরণ পোষণের জন্য দায়ী নহেন।

৫। গর্ভ হইয়াছে বুঝিতে পারিলে সেই তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সেই রমণী নির্দ্দিষ্ট রাজ কর্ম্মচারীকে সম্বাদ দিবেন। ঐ রাজকর্ম্মচারী তৎসম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় রমণীর যাহা যাহা আবশ্যক, প্রসব কালে ধাত্রী প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক এবং সন্তান প্রসূত হইলে প্রসূতী ও জাত শিশু সম্বন্ধে যাহা যাহা আবশ্যক তৎ সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। যত দিন সন্তান রমণীর গর্ভে বাস করিবে তত-দিন ঐ সন্তানের মঙ্গল জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা আদেশ করিবেন ঐ রমণী তাহা করিতে বাধ্য। তাহা করিতে তাঁহার যে ক্ষতি হইবে গবর্ণমেণ্ট সে ক্ষতি পূরণ করিবেন।

সন্তান প্রসূত হওয়ার পর হইতেই ঐ সন্তানের সহিত রমণীর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। তবে গবর্ণমেণ্ট যদি আবশ্যক বোধ করেন তবে উপযুক্ত বেতন দিয়া ঐ রমণীকে ঐ সন্তানের স্তন্যদাতা রূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৬। সন্তানের প্রতিপালন, বিদ্যাশিক্ষা, কার্য্যশিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই গবর্ণমেণ্টের উপরি অর্পিত হইল। পিতা মাতা তাহার কোন দায়ী হইবেন না।

এইরূপ বহুতর বিধানে পূর্ণ বৃহৎ আইন প্রচারিত হইল। সে সকল কথা প্রকাশ করিতে হইলে বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

এই নব বিধান জারি হইলে সকলেই সংসারের দায় হইতে মুক্ত হইবেন ভাবিয়া কল্পনাঙ্কিত ভবিষ্যৎ সুখের মনোহর ছবি দর্শন করিয়া মহা আনন্দে মগ্ন হইলেন। নারী সম্প্রদায়েরই আনন্দ বেসি হইল। কেননা তাঁহাদের বিশ্বাস সন্তান পালন করিতে হয় বলিয়াই তাঁহারা পুরুষের সহিত সর্ব্বতোভাবে প্রতিদ্বন্দীতা করিতে পারেন না। এক্ষণে সে অন্তরায় দূরীভূত হইল, এমন কি গর্ভাবস্থাতেও তাঁহাদের কোন কার্য্য ক্ষতি হইবে না। সে সময়ে তাঁহারা অধিক উপার্জ্জনই করিতে পারিবেন। তাঁহারা ভাবিলেন এইবার আমরা প্রকৃত স্বাধীন হইলাম। অনেকে এমনও ভাবিলেন এই বার পুরুষ গণকেই আমাদের অধীন হইতে হইবে। কেন না পুরুষেরা প্রভু হইয়াও চিরকাল রমণীর দাস, কেবল উদরান্নের জন্য স্ত্রী পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে। এক্ষণে স্ত্রীর অধীনত্বের সে কারণ রহিল না, কিন্তু পুরুষের অধীনত্বের স্বাভাবিক কারণ সমানভাবেই রহিল।

চতুর্থ দৃশ্য।

অপূর্ব্বদৃশ্য! অপূর্ব্ব জগতে মানবের অপূর্ব্বভাব! সকল মানবই আজি একই মাত্র উদ্দেশ্যে চলিতেছে। কেহ আর পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবার বর্গের ভরণপোষণ চিন্তায় ব্যস্ত নহে, কেহ কোন রূপ ব্যবসা বাণিজ্যের লাভ লোকসানের চিন্তায় ব্যগ্র নহে, কেহ প্রিয়তম দারা পুত্র শোকে আকুল নহে, কেহ পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ নহেন বলিয়া লোক সমাজে ঘৃণিত হয় না ও কেহ পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা না করিয়াও নিন্দিত হয় না। সকলেরই এক মাত্র চিন্তা উদর পূরণের ও এক মাত্র কার্য্য দাসত্ব। জীবনের পরে গতি কি হইবে তাহার জন্যও লোকের যেমন কোন চিন্তা নাই, মৃত্যুর পরকালের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্যও কাহারও কিছু মাত্র ব্যাকুলতা নাই; জীবনই মানবের চরম ও শেষ উদ্দেশ্য হইয়াছে। সুখে জীবন যাপন করিতে পারিলেই মানবের সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইল। বাঁধা গরু ছাড়া পাইলে যেমন মনের হর্ষে ইতস্ততঃ দৌড়া দৌড়ি করে মানবের অবস্থা আজি ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা—সমস্ত চিন্তা হইতে মানব মুক্ত হইয়াছে, সকলেই পান্তা ভাত বাতাস দিয়া খাইতেছে। সংসারের বা দেশের কোন প্রকার চিন্তাই এখন কাহাকেই করিতে হয় না। পুত্রাদির ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও শিক্ষাদান প্রভৃতি সমস্তের ভারই গবর্ণমেণ্টের উপর। কৃষি, শিল্প বাণিজ্য ও ভূসম্পত্তির লাভালাভ সমস্তই গবর্ণমেণ্টের; পরদুঃখ ও দেশের অনিষ্ট নিবারণ প্রভৃতির ভারও গবর্ণমেণ্টের উপর অর্পিত। আপনার

মাত্র উদর পূরণ এবং রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করিতে পারিলেই মানবের সকল কার্য্য করা হইল।

নূতন আইন অনুসারে এই সকল কার্য্য চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার। বৈষম্য বিদূরিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য; কেবল স্ত্রী পুরুষগত বৈষম্য নহে, জাতিগত বৈষম্য দূর করাও নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য ব্রাহ্মণাদি জাতির সম্মান নষ্ট করা হইয়াছে, ধনী ও রাজবংশের সম্মান ও পদ বিদূরিত হইয়াছে। নূতন নিয়ম অনুসারে রাজার ছেলে রাজা হয় না, ধনীর ছেলে ধনী হয় না। মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি এখন সাধারণের অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের হয়। তাই আজি দেশে রাজা নাই। সভা বিশেষ দ্বারা দেশ শাসিত হইতেছে। সভা এক্ষণে রাজশক্তি ধারণ করে এবং সভাপতি রাজার সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। দেশের লোকের নির্ব্বাচনানুসারে সভার সভ্য নির্ণীত হয়. এবং সভ্যগণ সভাপতি স্থির করেন। প্রতি বৎসরই নূতন সভ্য ও নূতন সভপতি নির্ণীত হয়। এই সভার নাম মহাসভা। মহাসভার সভ্যগণের কেবল সভার কার্য্য অর্থাৎ সভায় প্রস্তাবিত বিষয়ে মতামত দেওয়া মাত্র কার্য্য নহে। তাঁহারা এক এক জন এক কার্য্য-বিভাগের বা প্রদেশ বিশেষের তত্ত্বাবধায়ক। কেহ শিক্ষা বিভাগের, কেহ বাণিজ্য বিভাগের, কেহ পালন বিভাগের, কেহ সম্বাদ বিভাগের, কেহ অন্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। ইহাঁরা ও সভাপতি সকলেই নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত হয়েন। সভ্যগণ আপন আপন বিভাগের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করেন এবং আবশ্যক মত সভাস্থ হইয়া আইন ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের নিয়ম ও সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য নিরূপণ করেন। সভাপতি কোন্

সময়ে সভা আহ্বান করা প্রয়োজন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন ও আবশ্যক হইলে সভা আহ্বান করেন। সভার সমস্ত কাগজ পত্র তাঁহার জিম্মায় থাকে এবং সভ্যের সমস্ত আবেদন তাঁহার নিকট আইসে। দুই জন সভ্যের মতের সহিত তাঁহার মত তুল্য বিবেচিত হয়। এই মহাসভার কৃত নিয়ম অনুসারে দেশের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই মহাসভার হস্তে অনেক কার্য্য। দেশ রক্ষা, শান্তি স্থাপন, ভূমিসম্পত্তি কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায়ের সুনিয়ম স্থাপন, এবং শিশু ও অক্ষমগণের প্রতিপালন প্রভৃতি অনেক কার্য্য সভা দ্বারা সম্পাদিত হয়। সভ্যের সংখ্যা অনেক। অন্ততঃ প্রতি [illegible] লোকের মধ্যে একজন করিয়া সভ্য থাকে। সুতরাং এই বিংশতি কোটি লোকের আবাসভূমি ভারতের মহাসভায় অন্যূন দুই সহস্র সভ্য নিযুক্ত।

এই মহাসভার অধীনে দেশে দেশে শাখা সভা আছে। সেই দেশের সকল বিভাগের উপতত্ত্বাবধায়কগণ তাহার সভ্য এবং উপশাসনকর্ত্তা তাহার সভাপতি। ঐ শাখাসভার অধীনে আবার প্রতি জেলায় প্রশাখা সভা আছে; জিলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ তাহার সভ্য এবং মাজিষ্ট্রেট তাহার সভাপতি। প্রশাখাসভার অধীনে প্রতি থানায় একটী করিয়া পল্লবসভা আছে, পুলিশের কর্ত্তা তাহার সভাপতি। গ্রাম্য প্রধান প্রধান লোকের নির্ব্বাচনানুসারে পল্লব সভার সভ্য নির্ণীত হয় এবং নিম্ন সভা সকল হইতে পর পর উচ্চ সভা সকলের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। এই প্রকারে দেশের লোক দ্বারা দেশের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়।

এক্ষণে কেহ কাহারও ধনাধিকারী হইতে পারে না, সুতরাং কাহারও নিজের কিঞ্চিন্মাত্রও ভূমি সম্পত্তি, কোন প্রকার ব্যবসায়,

কোন প্রকার শিল্পাগার বা কোন প্রকার কৃষি কার্য্য নাই। সমস্তই গবর্ণমেণ্টের। কেহ আপন লাভের জন্য উক্ত প্রকারের কোন কার্য্য করিলে আইন অনুসারে দণ্ডিত হয়েন। করিবার কোন উপায়ও কাহারও নাই। কেন না যে কোন কার্য্যই করা যাউক সকলেতেই মূল ধনের আবশ্যক। কিন্তু পৈতৃক ধনে অধিকার না থাকায় কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও মূলধন থাকে না। যিনি ভালরূপ চাকরী পান তিনি কিয়ৎকাল চাকরি করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিতে পারেন বটে কিন্তু জীবনান্তে সঞ্চিত সম্পত্তি নিজের বা পুত্রাদির কোন প্রয়োজনে লাগিবে না ভাবিয়া কেহই ব্যবসায়াদিতে মূলধন আব[illegible]তে ইচ্ছুক হন না। গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিদ্বন্দীতা করিয়া লাভবান হইবার আশাও কেহ করেন না।

দেশে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আর নাই—সমস্তই বৃহৎ বৃহৎ নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর ও তাহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ নগরী। এমন এক খানি নগরী নাই যাহাতে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোকের বাস নাই। বড় বড় নগরীতে কোটী লোকেরও বাস আছে। নগর সকলের এক পার্শ্বে বৃহৎ উদ্যান ও চতুঃপার্শ্বে বৃহৎ মাঠ। যেরূপ স্থান হইতে অল্পব্যয়ে শিল্পজাত ও বাণিজ্যলব্ধ দ্রব্য সকল সর্ব্বত্র আমদানি ও রপ্তানি হইতে পারে, এবং যেরূপ স্থানে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতের ও বাণিজ্য করিবার উপযুক্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি অল্প ব্যয়ে আনা যাইতে পারে সেইরূপ স্থানে শিল্প ও বাণিজ্যালয় সকল স্থাপিত। নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, অতি অল্প মাত্র লোকের সাহায্যে সেই সকল যন্ত্র দ্বারা কৃষি শিল্প প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন হয়। বাণিজ্য কার্য্য আরও সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত

হয়। কারণ বাণিজ্য জন্য যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় তৎ সমস্তই গবর্ণমেণ্টের নিজের—কৃষিজাত, শিল্পজাত সমস্ত দ্রব্যই গবর্ণমেণ্টের নিজের এবং কি পাইকারি কি খরিদদারি সর্ব্বপ্রকার দোকানই গবর্ণমেণ্টের নিজের। কোন কার্য্যেই কেহ প্রতিদ্বন্দী নাই, কোন দ্রব্যই ক্রয় করিতে হয় না, কোন প্রকার পাথের ব্যয় কাহাকেও দিতে হয় না, যে দ্রব্য যে দরে ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারেন। ব্যয়ের মধ্যে কেবল লোকের মজুরি। সে মজুরি অর্থাৎ লোকের বেতনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। বহুবিধ উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়ায় অধিক লোকের আবশ্যকও নাই। তাড়িত দ্বারা শকট ও পোত চলিতেছে, তদ্দারা বহু দূরের দ্রব্য সকলও অতি অল্প লোক দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে। সমস্ত নগরই তাড়িতরথ দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন। নগরের মধ্যে তাড়িতরথ থাকিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনায় নগরের সর্ব্বত্র বাষ্পীয় রথে পরিব্যাপ্ত। উদ্যান ও মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে কৃষক প্রভৃতির থাকিবার ও শস্যাদি রাখিবার জন্য গৃহ আছে। ঐ সকল গৃহও নগরের সহিত বাষ্পীয়রথ দ্বারা সংলগ্ন। স্থানীয় অর্থাৎ নগরস্থ মনুষ্যগণ ও দ্রব্য সকল বাষ্পীয় রথ দ্বারা নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং উদ্যান ও মাঠে এবং ঐ ঐ স্থান হইতে নগরের স্থানে স্থানে নীত হয়।

নগর সকল বৃহৎ বৃহৎ ত্রিতল চতুস্তল অট্টালিকায় পূর্ণ। সমস্ত গৃহই গবর্ণমেণ্টের; অনুমাত্র ভূমি বা একটীও গৃহ অন্য কাহারও নাই। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকায় বাস করে। বৃদ্ধ, যুবক ও শিশুগণ ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস করে। বিদ্যালয়ের নিকট শিশুগণের বাস, কার্য্যস্থানের নিকট যুবক-

গণের বাস এবং প্রান্তস্থ নির্জনাংশে বৃদ্ধগণের বাসগৃহ। দরিদ্রাশ্রম, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, বাণিজ্যাগার, শিল্পাগার, বাজার, হোটেল, ধর্ম্মাধিকরণ, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আফিসগৃহ সুবিধামত স্থানে অবস্থিত অর্থাৎ যে কার্য্যালয় যে স্থানে থাকিলে সেই কার্য্যের ও সাধারণের সুবিধা হয় তাহা সেই খানে স্থাপিত। নগর মধ্যে সংকীর্ণ রাস্তা বা অপকৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর গৃহ একটীও নাই, সমস্তই সুপরিষ্কৃত সুপরিচ্ছন্ন সুবৃহৎ ও বিলক্ষণ বায়ুসম্পন্ন। অস্বাস্থ্য হইবার কোন আশঙ্কাই কোথাও নাই। সর্ব্বত্রই নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে, সকল স্থানেই নলদ্বারা পবিত্র বারি সঞ্চালিত হইতেছে, মল মূত্র প্রভৃতি দুর্গন্ধ দ্রব্য সকল মুহূর্ত্ত মাত্র কোন গৃহে থাকিতে পারে না, অধঃপ্রণালী দ্বারা সমস্তই দূরে নীত হয়। কাহারও কোনরূপ পীড়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি রোগীনিবাসে নীত হয়েন। সংক্রামক রোগীদিগের জন্য নগরের দূর প্রান্তে গৃহ আছে, এমত সুকৌশল করা হইয়াছে যে তথাকার বায়ু নগরে আদৌ আসিতে পারে না। সকল নগরই এই একই রূপ নিয়মে গঠিত।

লোকে নির্দ্দিষ্ট গৃহাংশে বাস করে, সংলগ্ন হোটেলে আহার করে, পার্শ্ববর্ত্তী বিপণী হইতে বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে এবং নির্দ্দিষ্ট চাকরি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ সঞ্চয় করে। শিশু জন্ম মাত্রই মাতৃ ক্রোড় হইতে শিশু-নিবাসে নীত হয় ও ধাত্রিস্তন্য ও অন্যান্য কৃত্রিম পেয় পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাধীনে থাকিয়া পড়িতে থাকে। ৮ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে ৮। ১০টী পরীক্ষা দিতে হয়।

যাঁহারা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাঁহারা দেশের সর্ব্বোচ্চ পদ গুলি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের সাধারণ নাম 'উত্তীর্ণ'। যাহারা একটীও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না তাহারা 'অনুত্তীর্ণ' আখ্যা ধারণ করিয়া মেথর মুদ্দাফরাস প্রভৃতির জঘন্য কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে। যাহারা কেবল অষ্টম বর্ষদেয় ১ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহারা ভার বহন প্রভৃতি শ্রমজীবীর কার্য্য করে, যাহারা দ্বাদশ বর্ষদেয় দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহারা কৃষি কার্য্য করিতে পারে, যাহারা পঞ্চদশ বর্ষদেয় তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহারা শিল্প কার্য্য করিবার অধিকার পায়, যাহারা অষ্টাদশ বর্ষদেয় চতুর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহারা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, যাহারা বিংশবর্ষদেয় পঞ্চম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহারা কেরানিগিরি প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী হয়। দ্বাবিংশ বর্ষদেয় ষষ্ঠ পরীক্ষোত্তীর্ণগণ শিক্ষক ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেতনের কেরানিগিরি প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারেন। ২৫ বৎসরে সর্ব্বোত্তীর্ণ না হইলে কেহ শত মুদ্রার অধিক বেতনের পদ পান না। ২০ বৎসরে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়। শেষ পরীক্ষা দুইটী কার্য্য করিতে করিতে দিতে হয়। ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকলে গবর্ণমেণ্ট হইতে আবশ্যক সর্ব্বপ্রকার সহায়তা প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে সকলেই উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য। প্রথম বৎসর কোন প্রকার কর দিতে হয় না। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম হইতে বিবাহকর প্রভৃতি সকল প্রকার করই দিতে হয়। এই ২০ বৎসর কি অনুত্তীর্ণ কি প্রথম দ্বিতীয়াদি পরীক্ষোত্তীর্ণ সকলেই গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আপন আপন অধিকারের কার্য্য শিক্ষা করে; অর্থাৎ পরীক্ষার

কলানুরূপ মেথরগিরি, মুটেগিরি, হল চালন, শিল্প, বাণিজ্য ও কেরানিগিরি প্রভৃতি শিক্ষা করে। একাল পর্য্যন্ত তাহারা আহারাদি ও প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সঞ্চয় করিবার জন্য কিছুই পায় না। ২০ বৎসর পরে সকলেই পরীক্ষার নম্বরানুসারে কার্য্যেনিযুক্ত হয়; অর্থাৎ যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক নম্বর পাইয়াছে তাহারা অগ্রে ও অধিকতর বেতনের কার্য্য পায়। কার্য্য সংখ্যা অপেক্ষা উত্তীর্ণ সংখ্যা বেসি হইলে যাহাদের নম্বর সর্ব্বাপেক্ষা অল্প তাহারা কার্য্য পায় না। কিন্তু তাহারা নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে নিম্ন দলের সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাচিত হয়। যাহারা কোন কার্য্য পায় না তাহারা দরিদ্র আশ্রমে থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের সকল রকম কার্য্য করিয়া দেয় ও দরিদ্রের উপযোগী আহারাদি পায়। তাহারা কিছুই বেতন পায় না। দরিদ্রাশ্রমবাসীগণ বিবাহ বা কোন প্রকার দাম্পত্য ব্যবহার করিতে পারে না। আর সকলেই বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু চিরবিবাহ কেহই করে না; রুচি অনুসারে নিয়তই লোকে নূতন দয়িত গ্রহণ করিয়া থাকে। রূপের উৎকর্ষ ভিন্ন দয়িত নির্ব্বাচনের আর কোনও পরীক্ষা এক্ষণে নাই। কেন না এক্ষণে স্ত্রী বা পুরুষ কেহ কাহারও সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক কোন প্রয়োজনে লাগে না, রিপু-চরিতার্থই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য,সুতরাং বিবাহে গুণ দেখার আদৌ আবশ্যক নাই, রিপু যাহা চায় তাহাই মাত্র লোকে অনুসন্ধান করে।

এই প্রকারে সমস্ত কার্য্যই গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অনুসারে সুন্দর রূপে চলিতেছে, কাহারও কোন প্রকার চিন্তা নাই; সকলেই সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভোজন করে; পরিষ্কৃত বায়ুসম্পন্ন গৃহে

বাস করে, এবং পীড়া হইলে যথানিয়মে চিকিৎসিত হয়। কেহ কোনরূপ স্বাস্থ্য ভঙ্গকর কার্য্য করিতে বাধ্য হয় না। কেন না কাহাকেই নিজের বা পুত্রাদি পরিজনবর্গের উদরান্ন বা পীড়াদির জন্য কোন প্রকার চিন্তা, অসময়ে ভোজন বা রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি অতি ক্লেশকর ও স্বাস্থ্যনাশকর কার্য্য করিতে হয় না, কাহাকেই পুত্র শোকাদিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিরোধ করিতে হয় না, কাহাকেই নিজের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কোন কার্য্যের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম বা দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে হয় না, কাহাকেই চাকরির উমেদারী করিবার জন্যও অতিরিক্ত রৌদ্র বতাদি ভোগ করিতে হয় না এবং ভবিষ্যৎ বংশায়াদ্বিদের জন্য অর্থসঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্যও কাহকে কোনরূপ অতি ক্লেশকর কার্য্য করিতে হয় না। কাহারও কোন প্রকার বিষয় সম্পত্তি নাই ও কাহাকেও কোনও প্রকার ঋণ আদান প্রদানাদি করিতে হয় না, সুতরাং তজ্জন্য অবশ্যম্ভাবী মকদ্দমাদি করিবার জন্য ধর্ম্মাধিকরণ ও ব্যবহারজীবী প্রভৃতির নিকট গমনাদি জন্য কাহাকেও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সকলেই পরীক্ষার ফলানুরূপ চাকরী করিয়া জীবিকা অর্জন করে, সেই চাকরি স্থানের সন্নিহিত গৃহে বাস করে, সম্মুখস্থ হোটেলে প্রস্তুত যথাযোগ্য খাদ্য ভোজন করে ও সুবিন্যস্ত শয়ন-গৃহে নিদ্রা যায়। কি বৈষয়িক কি সাংসারিক কি শোককর কি অলাভকর কোন চিন্তাই ক্ষণ মাত্র কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় না। কাযে কাযেই কাহারও অকালে শরীর ভগ্ন হয় না, সকলেই দীর্ঘজীবী হয় ও বহু সন্তান উৎপাদন করে। সন্তান উৎপাদন হইবা মাত্রই তাহা মাতৃঅঙ্কচ্যুত হয়, তজ্জন্যও রমণীগণ বহু সন্তান প্রসব করে।

অতি অল্প দিনেই দ্বিগুণের অধিক লোক সংখ্যা হইল। সমস্ত লোকের খাদ্য উৎপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকারে ভূমি বৃদ্ধি ও অল্প ভূমিতে অধিক শস্য উৎপাদন করিবার কল প্রস্তুত হইল। সমস্ত বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলা হইল, বহুতর প্রশস্ত খাল, পুষ্করিণী ও সমুদ্রাংশ ভরাট করা হইল ও বাসগৃহে অধিক ভূমি না লাগিতে পারে তজ্জন্য ৭।৮ তল অট্টালিকা প্রস্তুত হইতে লাগিল। অতি অল্প পরিমিত ভূমিতে বহু সংখ্যক লোক বাস করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রকমের কলের সৃষ্টি হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা জল মধ্যেও শস্য জন্মিতে লাগিল। অন্যান্য প্রকার কলও অনেক হইল। দশ জন মাত্র লোকের সাহায্যে সহস্র মণ তণ্ডুল উৎপন্ন হইতে লাগিল, অতি অল্প সময়ে সহস্র সহস্র বস্ত্র নির্ম্মিত হইতে লাগিল, ছয় মাসের পথ এক ঘণ্টায় যাইবার উপায় হইল। সকল প্রকার কার্য্যই যন্ত্রবলে সম্পাদিত হইতে লাগিল। মানবশ্রমের অতি অল্পই আবশ্যক থাকিল। সুতরাং লোকের চাকরী পাওয়া দায় হইল। একে লোক-সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে যন্ত্র দ্বারা অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; মানব চাকরী পাইবে কি প্রকারে? ক্রমে ক্রমে দরিদ্রাশ্রম পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ দরিদ্রাশ্রম বাসীগণ কিছু বসিয়া খাইতে পায় না, তাহাদিগকে সামর্থ্য অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। যে মানবশ্রমের প্রয়োজন তাহা দরিদ্রাশ্রমবাসী ব্যক্তিগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইতে লাগিল। সুতরাং অন্য লোকে আর কার্য্য পায় না; কাযেই সমস্ত লোককেই দরি-দ্রাশ্রমবাসী হইতে হইল। অধিক কি সর্ব্বোত্তীর্ণগণও দরিদ্রা-শ্রমবাসী হইল। বেতনভোগী লোক আদৌ থাকিল না। সক-লেই সামান্য আহারীয়াদি মাত্র পাইয়া কার্য্য করিতে লাগিল।

সকল ব্যক্তিই দরিদ্রাশ্রমবাসী হইল সুতরাং আর দরিদ্রাশ্রমের অগৌরব থাকিল না এবং 'দরিদ্রাশ্রমবাসীগণ বিবাহ করিতে পারিবে না' এ নিয়মও আর রাখা যাইতে পারিলনা। কেন না সে নিয়ম রাখিতে হইলে কাহারও সন্তান হইতে পারে না, সুতরাং এক কালে মানবজাতির লোপ হয়। যেমন ঐ নিয়ম রহিত হইল, অমনি সকল লোকেই বিবাহ করিতে আরম্ভ করিল, অতি অল্প দিনের মধ্যে মানব বংশ এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, পৃথিবীতে থাকিবার স্থানই হইল না। গবর্ণমেণ্ট আর তাহাদের আহারীয় যোগাইতে পারেন না। মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার সম্ভব হইল। নানা লোকে নানা প্রকার চিন্তা করিল, কিন্তু কোন উপায়ই অবধারিত হইল না। দুর্ভিক্ষাদির জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদায় খাদ্য নিঃশেষ হইয়া গেল, তথাপি সকলের অন্ন জোটে না। গবর্ণমেণ্ট সকলেরই খাদ্য দিবার দায়ী, সুতরাং কোন উপায় না পাইয়া Survival of the fittest এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া একটী পরীক্ষার আদেশ করিলেন—যাহারা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইল তাহাদিগকে গুলি নিক্ষেপে বিনষ্ট করা হইল। কোটী কোটী মনুষ্য এইরূপে হত হইল, ভীষণ চীৎকার রবে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। এই নিদারুণ ভীষণ পৈশাচিক ব্যবহার দেখিয়া হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ভবিষ্যতে আর এরূপ বিপদ উপস্থিত না হইতে পারে তজ্জন্য নিয়ম হইল পরীক্ষা বিশেষে উত্তীর্ণ না হইলে কেহ বিবাহ করিতে পারিবেন না। ঐ পরীক্ষা-প্রণালী অত্যন্ত কঠিন হইল, সুতরাং অনেকেই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া অবিবাহিত থাকিল। ঐ অনুত্তীর্ণগণই এক্ষণে দরিদ্রাশ্রমবাসী হইল। আর সকলে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট হোটেলে বাস করিতে লাগিল।

আবার একটী দোষ হইল। লোকের চাকরী থাকিল না বটে কিন্তু কার্য্য করুক আর না করুক সকলেই আহারাদি পাইতে লাগিল। এ দিকে যন্ত্রের প্রাচুর্য্য বশতঃ সকল লোকের উপযোগী কার্য্য না থাকিলেও ঐ সকল যন্ত্রাদি চালনাদি জন্য ও গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক পরামর্শাদি করিবার জন্য অনেক লোকের শ্রমের আবশ্যক হয়। সে সকল আবশ্যক কার্য্য কেহই করিতে চায় না। কারণ কার্য্য করা না করা উভয়েতেই সমান ফল। অর্থাৎ কার্য্য করিলে আহারাদি ভিন্ন আর কিছু পায় না, না করিলেও লোকে তাহা পায়। সকল লোককে কার্য্য দিতে না পারিয়া গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন। যখন কার্য্য করায় ও না করায় সমান ফল তখন কেন লোকে কার্য্য করিবে? এই দোষ পরিহার করিবার জন্য পুনরায় পূর্ব্ববৎ পরীক্ষাদির নিয়ম হইল অর্থাৎ যে যেমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে সে সেইরূপ কার্য্য ও তদনুরূপ বসন, ভূষণ ও খাদ্যাদি পাইবে, যাহারা কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না তাহারা অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিবে এইরূপ নিয়ম হইল। তখন সকলেই ভাল কার্য্য করিবার জন্য যত্নশীল হইয়া পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করিল ও বহু সংখ্যক লোক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইল। কিন্তু কার্য্যের অল্পতা প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট উত্তীর্ণ সকল লোককে কার্য্য দিতে পারিলেন না। সুতরাং আবার ভাল মন্দ এক দলে পড়িল। পরিশেষে নিয়ম হইল কোন ব্যক্তিকেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে না। সমস্ত কার্য্যই পালা অনুসারে সকলকে করিতে হইবে। তদনুসারে সকলেই পালা মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সকল মনুষ্যই প্রতি মাসে ৪। ৫ দিন কার্য্য করে ও অবশিষ্ট সময়ে বসিয়া বসিয়া ভোজন করে ও পশুবৃত্তির অনুশীলন করে।

দিন দিন আরও নূতন প্রকারের যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। মনুষ্যকে আর কিছু মাত্র শ্রম করিতে হয় না। সমস্ত কার্য্যই যন্ত্রবলে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

মানবশক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল। কাহাকেই এক্ষণে পরিশ্রম করিতে হয় না, সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া বসিয়া খায়, সকলেই উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করে, সকলেই তৈয়ারি অন্ন ভোজন করে, সকলেই অশ্বশকটাদিতে আরোহণ করে এবং দরিদ্রাশ্রম বাসীগণ ভিন্ন সকলেই ইচ্ছামত বিবাহ করে ও সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বাস করে—মানব উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কাহাকেই প্রকৃত সুখী বলিয়া বোধ হইল না। চেহারা দেখিলে বোধ হয় যেন সকলেই নিয়ত অতৃপ্ত। দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন ও বহু-বিধ রসনাতৃপ্তিকর বিবিধ দ্রব্য ভোজন করিয়াও কাহারও মনে কোন প্রকার সুখ নাই, জীবনে কাহারও রুচি নাই। কেন না অপত্যস্নেহ, পিতৃভক্তি, ঈশ্বরানুরাগ, দাম্পত্যপ্রেম, সখ্যতা প্রভৃতি কোমল প্রণয়-ব্যঞ্জক মধুর ভাবাবলী, দয়া ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি দিব্য ভাবসমূহ, শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি বীর ভাব ইত্যাদি মানবীয় ভাব সকল মানব মনে আদৌ উদিত হয় না। সকল মানবই কেবল উদর পূরণ, নিদ্রা ও রিপু চরিতার্থ জনিত অসার পাশব সুখেরই আস্বাদন মাত্র পায়, বিমল মানবীয় সুখের আস্বাদন আদৌ কেহ পায় না। পশুসম্ভব সকল প্রকার সুখও তাহাদের ভাগ্যে নাই। কেন না পশুরা বাল্য কালে কিছু দিনও মাতৃস্নেহ পায়, মানবশিশু তাহাও পায় না। তাহারা জন্মমাত্রই পিতৃমাতৃ হীন হয়। কখনও তাহারা পিতা মাতার সোহাগ, ভ্রাতা ভগিনীর আদর, পুত্র কন্যার ভক্তি, পতি

পত্নীর প্রেমালিঙ্গন পায় না। যুবক যুবতীগণ পতি পত্নী ভাবে মিলিত হয় বটে, কিন্তু সে মিলন বেশ্যা মিলনের ন্যায়ও তৃপ্তিকর নহে। কেন না বেশ্যাগণও স্বার্থসাধন মানসে অনেকরূপ কৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন ও নানা প্রকার প্রেমালাপ করে, কিন্তু এক্ষণকার দম্পতী মধ্যে সে বেশ্যাসঙ্গসুলভ সুখও নাই। কেন না এক্ষণে কেহ কাহারও নিকট কিছু আশা করে না, কেবল মাত্র রিপু চরিতার্থ জন্য পরস্পরে মিলিত হয়। সে মিলন সম্পূর্ণরূপে পশুর মিলনেরই তুল্য। ক্রীড়া ভিন্ন মানবের কাল কাটাইবার আর কিছুই অবলম্বন নাই। কিন্তু নিয়ত ক্রীড়া করিয়া লোকে পরিশ্রান্ত হইয়াছে, কোন খেলাই আর ভাল লাগে না। নাটক নবেল পাঠ ও অভিনয়াদি দর্শনেও কাহারও মনে সুখ বোধ হয় না। কেন না শিশুপুত্রের আধ আধ বাক্য যে কি মধুর, পতিপ্রাণা রমণীর প্রেমালিঙ্গন যে কি সুখকর, দরিদ্রের উদর পূর্ত্তি করিলে যে কি অনুপম আনন্দ হয় এ সকলের মধুর আস্বাদন যাহারা কখনও পায় নাই, তাহারা ঐ সকল মানবীয় ভাবপ্রকাশক নাটক নবেলের মর্ম্ম কি বুঝিবে? অভিনয়ের মর্ম্মই বা কি বুঝিবে? এই সকল কারণে কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ কাহারই মনে কিঞ্চিন্মাত্র সুখ নাই, সকলেই অতি কষ্টে দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করে। লোকে সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারী। সন্ন্যাস ও সংসারের সুখের ভাগী কেহ নহে কিন্তু ঐ উভয়ের দুঃখের ভাগী সকলেই।

আশ্চর্য্য এই যে, যে বৈষম্য নিবারণ জন্য মানবকে সর্ব্ব প্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল সে বৈষম্য কিন্তু ঘুচিল না। সত্য বটে এক্ষণে কেহ ধনী কেহ নির্ধন নহে, কেহ উচ্চবংশ-জাতও কেহ নীচবংশজাত বলিয়া পরিচিত নহে. কেহ উচ্চপদ

ধারী ও কেহ নিম্নপদধারী নহে, কেহ উত্তমর্ণ কেহ অধমর্ণ নহে, কেহ দাতা কেহ গ্রহীতা নহে, কেহ উপকারকারী ও কেহ উপকারাকাঙ্ক্ষী নহে, কেহ বলবান্ কেহ দুর্ব্বল নহে, কেহ অট্টালিকাবাসী ও কেহ কুটীরবাসী নহে, কেহ উজ্জ্বল বহুমূল্যবেশধারী ও কেহ ছিন্নবসনধারী নহে, সকলেই একই রূপে ভোজন, বেশ বিন্যাস ও অবস্থানাদি করেন বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈষম্য বিদূরিত হয় নাই। পুরুষের সহিত স্ত্রীর বৈষম্যও ঘুচে নাই, উচ্চ শ্রেণীর পুরুষের সহিত নিম্ন শ্রেণীর পুরুষের বৈষম্যও বিদূরিত হয় নাই। কেন না যে সকল লোক বিবাহপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহারা নিতান্ত পরাধীন; বন্দী হইতে তাহাদের অবস্থা কিছুতেই উন্নত নহে। কেন না তাহারা পাছে কোনরূপ দাম্পত্য-ব্যবহার করে এই জন্য নিয়ত প্রহরীবেষ্টিত থাকে। তাহারা যাহা খাইতে পায় তাহা তাদৃশ রুচিকর নহে এবং যে গৃহে তাহারা বাস করে তাহা অনেকাংশে অপকৃষ্ট। তাহাদের অবস্থা হইতে পশুর অবস্থা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। স্ত্রীজাতিরাও আপনাদিগের অবস্থাকে পুরুষের সহিত তুল্য বিবেচনা করে না; কেন না রমণীগন সন্তানসুখে বঞ্চিত অথচ ভয়ানক গর্ভযন্ত্রণা পায়। তাহারা পুরুষদিগের সহিত সর্ব্ব প্রকারে সমান হইবার মানসে গর্ভযন্ত্রণা এড়াইবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিয়া পরিশেষে একরূপ ঔষধ আবিষ্কার করিল, তাহা সেবন করিলে সন্তান হয় না। সকল রমণীই সেই ঔষধ সেবন করিয়া গর্ভযন্ত্রণার দায় হইতে উদ্ধার হইল। কিছু দিন আদৌ কাহারও সন্তান জন্মিল না, সুতরাং স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক বৈষম্যও ঘুচিয়া গেল। কিন্তু সৃষ্টি নাশ হইবার উপক্রম দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীদিগকে ঐ ঔষধ সেবন করিতে নিষেধ করিলেন। সমস্ত স্ত্রী

সমাজ মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টে ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিল। তাহাদের আবেদনের মর্ম্ম এই যে গর্ভযন্ত্রণা নিদারুণ কষ্টদায়ক। কেবল স্ত্রীজাতিই সেই ভয়ানক কষ্টকর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে, পুরুষকে সে কষ্ট আদৌ ভোগ করিতে হয় না। যখন পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা তখন একা স্ত্রী কেন এই ভয়ানক যন্ত্রণা পাইবে? সন্তান না হইলে সৃষ্টি নাশ হয় সত্য কিন্তু কেবল রমণী জাতিকে কষ্ট দিয়া সৃষ্টি রক্ষার চেষ্টা করা কি নিতান্ত অন্যায় নহে? যদি সৃষ্টিরক্ষা করা একান্তই আবশ্যক হয় তবে যাহাতে পুরুষেরাও গর্ভ ধারণ করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করা হউক অথবা যাহাতে গর্ভ ধারণাদিতে আমাদের অসুখ না হয় তাহার উপায় বিধান করা হউক। তাহা না করিয়া কেবল আমাদিগকে কষ্ট দিয়া সৃষ্টি রক্ষার চেষ্টা করা নিতান্ত অন্যায়। সৃষ্টি রক্ষার জন্য কি কেবল আমরাই দায়ী? পুরুষের কি কিঞ্চিন্মাত্রও দায়ীত্ব নাই? কেন, সৃষ্টি রক্ষায় কি আমাদের কিছু বিশেষ লাভ আছে? অবশ্য না। তবে কেন আমরা এই ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিব? ইহাকে কি স্ত্রী স্বাধীনতা বলে? না ইহার নাম সাম্য? পূর্ব্বে সন্তানের মুখ দেখিবার আশয়ে স্ত্রীগণ এই অসহ্য কষ্ট সহ্য করিত, সন্তানের মুখ দেখিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইত। কিন্তু এক্ষণে সে সুখের আশা আদৌ নাই, এখনকার এই নীরস কষ্ট আমরা সহ্য করিতে পারি না। অধিকন্তু এক্ষণে প্রসবের পর সন্তান নিকটে না থাকায় স্তন্য দুগ্ধ নির্গত হইতে না পারায় একটী নূতন রকমের ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে ও তজ্জন্য প্রায় প্রতি বৎসরই আমাদিগকে গর্ভধারণের কষ্ট গ্রহণ করিতে হইতেছে। অতএব প্রার্থনা, হয় উপরোক্ত রূপ কোন উপায় বিধান

করা হউক, না হয় আমাদিগকে গর্ব্ভনিবারক ঔষধ সেবনে অনুমতি প্রদান করা হউক। তাহা না করিলে আমাদের প্রতি নিতান্ত পক্ষপাত প্রদর্শন ও অত্যাচার করা হইবে। দরিদ্রাশ্রমবাসী-গণও এক আবেদন পত্র প্রদান করিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, যখন সকল মনুষ্যকেই পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন তখন কি জন্য কেহ উচ্চ অবস্থায় বাস ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া স্বাধীনতা জনিত সুখে কাল কাটাইবে ও কেহ নিতান্ত ঘৃণিত ভাবে বাস ও জঘন্য দ্রব্য ভোজন করিয়া সর্ব্বদা প্রহরীবেষ্টিত হইয়া চিরবন্দীর অবস্থায় থাকিয়া চিরকাল রিপুজনিত মহান্ কষ্ট ভোগ করিবে। পরমেশ্বর কি আমাদিগকে রিপু বৃত্তি সকল প্রদান করেন নাই? অবশ্য সকলেরই কামাদি রিপু চরিতার্থ করিবার ও স্বাধীন ভাবে বাস করিবার অধিকার আছে। তবে কেন আমরা ঈদৃশ পশু অপেক্ষাও অপকৃষ্ট অবস্থায় বাস করিব? সকল লোক বিবাহ করিলে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও তত অধিক লোকের অন্ন কুলায় না সত্য, কিন্তু তজ্জন্য কেবল আমরাই চিরকাল কষ্ট পাইব কেন? সকলেই কেন পালা মত বন্দীভাবে কালযাপন করুন না? তাহা না করিয়া কতকগুলিকে চিরসুখী ও কতকগুলিকে চিরদুঃখী করাই কি ন্যায়সঙ্গত? ইহার নাম কি স্বাধীনতা? না ইহাকে সাম্য বলা যায়? অতএব প্রার্থনা, হয় সকল মানবকেই নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী রাখিয়া লোকসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করা হউক, না হয় আমাদি-গকে কারামুক্ত করা হউক ও বিবাহ করিতে অনুমতি প্রদান করা হউক।

মহাসভায় আবেদন পত্র অর্পিত হইল। কিন্তু দরিদ্রাশ্রমবাসী দিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে হইলে স্বয়ং সভ্যগণকেই বন্দী

হইতে হয়,এই জন্য সে দরখাস্ত না মঞ্জুর হইল। কিন্তু স্ত্রীজাতির দরখাস্ত লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মহাগণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। স্ত্রী সভ্যগণ সকলেই আপনাদিগের স্বার্থসাধন জন্য স্ত্রী আবেদনকারী দলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। কিন্তু পুরুষ সভ্যগণ বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলেন। উভয় দলের সংখ্যাই সমান' সুতরাং মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। পরিশেষে সভাপতি পুরুষ ছিলেন বলিয়া পুরুষপক্ষের মতকেই পুরুষেরা প্রবল বলিয়া গণ্য করিলেন। স্ত্রী সভ্যগণ তাহাতে আপত্তি তুলিলেন, তাঁহারা ঐ বিধি মানিবেন না বলিলেন। সমগ্র নারী সমাজ এক পক্ষ হইল দরিদ্রাশ্রমবাসী পুরুষগণও সেই সঙ্গে যোগ দিল, অধিকাংশ লোকই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ হইল। ভয়ানক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল! দরিদ্রাশ্রমবাসীগণ কারাগার পরিত্যাগ করিল, সকলে মিলিয়া গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডার সকল লুটিতে আরম্ভ করিল। তখন সভাপতি বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সৈন্য চালনা করিলেন। কিন্তু স্ত্রী সৈন্যগণ আজ্ঞা মানিল না, তাহারা বিদ্রোহী পক্ষাবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। উভয় দলে ভয়ানক অস্ত্রদ্বন্দ্ব বাধিল। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় যুদ্ধবিদ্যারও অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল—এক এক কামানে সহস্র সহস্র মনুষ্য ধ্বংস হইতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয় দলের প্রায় সমস্ত নিঃশেষ হইল। অতি অল্প সংখ্যক মনুষ্য অবশিষ্ট থাকিল,তাহারা পলায়ণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিল।

এই সময়ে আর একটী বিপদ উপস্থিত হইল। বনবাসী জীবগণ সমবেত হইয়া এক সভা করিল। উল্লুক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, ভাই সকল! আমরা যখন সকলেই পরমেশ্বরের সৃষ্ট তখন আমাদের সকলেরই অধিকার অবশ্য সমান।

কেন না ঈশ্বর কখনও পক্ষপাতী নহেন। তিনি যাহা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সমান করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মানবগণ নিতান্ত অন্যায় করিয়া আমাদিগকে অধীন করিয়াছে; আমরা নিতান্ত নিশ্চেষ্ট তাই আমরা এই অধীনতা সহ্য করিতেছি। কেন মনুষ্যগণ আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবে? কেন আমারা তাহাদের সহিত সমান হইব না? যখন মানবগণের মধ্যে দুর্ব্বল সবল, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান, স্ত্রী পুরুষ সকলেই সমান হইল তখন পশুতে মানবে সমান হইবে না কেন? যে সূত্র অবলম্বনে মানবগণ পরস্পর সমান হইতেছে, সে সূত্র অবলম্বনে জীবগণ অবশ্য পরস্পর সমান হইবে। তাহা যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে নিতান্ত পক্ষপাতী বলিতে হয়। আমরা তাঁহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে তিনি আমাদিগকে চির কাল ছোট করিয়া রাখিবেন? চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয় ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ। অতএব আইস আমরাও স্বাধীন হইবার চেষ্টা করি। যে মনুষ্য বাধা দিবে তাহাদিগকে আমরা বিনাশ করিব। ঐক্যই প্রধান বল। সকলে মিলিত হইলে আমরা অনায়াসে মানবজয় করিতে পারিব। উল্লুকের এবম্বিধ বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পশু মিলিত হইয়া আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টায় মানবের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তুগণ অবশিষ্ট মানব মণ্ডলীকে আক্রমণ করিল। পরস্পরের ঘোর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে উভয় দলই লয় প্রাপ্ত হইল। শৃগাল প্রভৃতি যেসকল ক্ষুদ্র প্রাণী দূরে থাকিয়া বাঁচিয়া গেল তাহারাই এক্ষণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইল। কিন্তু এক্ষণে সকল জীবই জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সকলেই সাম্য তত্ত্ব অনুশীলন

করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। ইন্দুর, বিড়াল, ভেক, সর্প, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিরাও জ্ঞানবলে পরস্পর সমান হইবার চেষ্টা করিল ও পরস্পরের সংঘর্ষণে লয় প্রাপ্ত হইল। উদ্ভিদেরাও জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয় নাই, তাহারাও পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করিতে লাগিল। অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত গুলঞ্চ বৃক্ষের বিবাদ হইল। গুলঞ্চ অশ্বত্থকে কহিল তুমিও ঈশ্বরের সৃষ্ট, আমিও ঈশ্বরের সৃষ্ট, তবে তুমি কেন এত বড় হইয়া এত অধিক স্থান অধিকার করিয়াছ ও আমি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া অতি অল্প মাত্র স্থানে আবদ্ধ আছি। এই বলিয়া তাহারা সমান হইবার জন্য পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল ও ক্রমে সমগ্র উদ্ভিদ্ কুলের ধ্বংস হইল। ক্রমে জড় জগতেও সাম্য তত্ত্ব প্রচারিত হইল। অত্যুচ্চ গিরি ও নিম ভূমি পরস্পর বিবাদ পরায়ণ হইল, তাড়িত, তাপ, জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি সকলেই পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। যাহার যে গুণ অন্য হইতে অল্প সে তজ্জন্য হিংসা করিতে লাগিল। ক্রমে সকল পদার্থেরই লয় হইল। তখন সমগ্র বিশ্ব আকাশময় হইল। এইবার সমস্ত গোল মিটিয়া গেল—আর কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ করিবার নাই—আর বিশ্বে কিঞ্চিন্মাত্রও বৈষম্য নাই। বিশ্ব এক্ষণে সম্পূর্ণ সাম্য ভাবে পরিপূর্ণ। কেন না এক্ষণে আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই—তাপ, আলোক পর্য্যন্ত নাই। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড কেবল মাত্র গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং কে কাহার সহিত বিবাদ করিবে? দুই নাই—ছোট বড় ভেদও নাই।

উপসংহার।

ভয়ানক দৃশ্য! অথবা কোন দৃশ্যই নাই! সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, পৃথিবী নাই, জীব নাই, উদ্ভিদ্ নাই, স্থল নাই, জল নাই, বায়ু নাই, অপ নাই, আলোক নাই, কিছুই নাই, কেবলই অন্ধকাররাশি চারিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। দৃষ্টি আদৌ চলে না—সকল ইন্দ্রিয়ই অচল হইল, নিতান্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। ভয়ে শরীর নিষ্পন্দ হইল। কোন দিকে কিছুই দেখিতে পাই না—একটী সামান্য শব্দও কোন স্থানে শুনিতে পাওয়া যায় না। ক্রমে আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও হারাইলাম—আমি আছি কি না তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

হঠাৎ সেই ঘোর অন্ধকাররাশি ঘোর অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই সেই আলোক রাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। পূর্ব্বদৃষ্ট অন্ধকার ও এই আলোকের বিশেষ প্রভেদ বোধ হইল না। কেন না ঐ আলোক সাহায্যে কোন পদার্থের জ্ঞান জন্মিল না। ঐ আলোক দ্বারা আলোক ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। তাপেরও সংস্রব সে আলোকে নাই। তথাপি সে আলোক চক্ষু সহিতে পারিল না। চক্ষু মুদিত করিলাম। কিন্তু সে আলোক মুদিত চক্ষু মধ্যেও প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ মুদিত নয়নে থাকিয়া যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য। দেখিলাম উহা কেবল আলোক রাশি নহে, আলোকে গঠিত ভুবনমোহন মূর্ত্তি। সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তির আদি অন্ত দেখিতে পাইলাম না, অথচ বোধ হইল যেন হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গই দেখিতে পাইতেছি। মস্তকোপরি নিম্ন দেশে, উভয় পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে যে দিকে দেখি

সেই দিকেই সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়, এমন একটু স্থানও নাই যেখানে সেই অপূর্ব্ব পুরুষ অবস্থিত নহেন। আপনার হৃদয় মধ্যেও সেই মূর্ত্তি বিরাজিত রহিযাছেন দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে আবার কি দেখিলাম। দেখিলাম কোটী কোটী সূর্য্য চন্দ্র, অগণিত গ্রহ নক্ষত্র, জীব জন্তু তরুলতা সমন্বিত অগণ্য পৃথিবী সেই দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। প্রতি নখরে সহস্র সহস্র সৌরজগৎ পরিদৃশ্যমান হইল। তখন মনে হইল ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে যে বিরাট রূপ দেখাইয়াছিলেন আমি কি তাহাই দেখিলাম? সেই বিরাট দেহে যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম তাহা সেই সময়েই ধারণা হইয়াছিল এক্ষণে তাহা প্রকাশ করিবার আর সাধ্য নাই। যাহা কখনও কল্পনাতেও উদিত হয় নাই, যাহা একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ ছিল, যাহাকে মূর্খকল্পনা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম এমন লক্ষ লক্ষ ব্যাপার সেই দেহ মধ্যে সংসাধিত হইতেছে দেখিলাম। মানব দেহে যেমন শিরা ও ধমনী দ্বারা হৃদয় হইতে শোণিত বহির্গত ও হৃদয়ে আনীত হয় ও তথা হইতে বিশুদ্ধ হইয়া যথা স্থানস্থিত যন্ত্র সহ মিলিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, মাংস প্রভৃতি শরীরের উপযোগী পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পদার্থ সকল সেই বিরাট পুরুষ হইতে উৎপন্ন ও পুনরায় তথায় নীত হইতেছে এবং তথা হইতে বিশুদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ও জীবরূপে পরিণত হইতেছে। দেখিলাম চন্দন বিষ্ঠা, সুবর্ণ মৃত্তিকা, কীট মানব, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মুর্খ, পুরুষ স্ত্রী সমস্তই এক উপাদানে নির্ম্মিত হইতেছে ও পরিণামে একই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

সম্পূর্ণ।